(ফুলের সাজি)

চতুর্থ অধ্যায়।

মনোরমাকে রাজপুরুষগণ যখন পথ দিয়া লইয়া যাইতে লাগিল, তখন সে অচৈতন্য হইয়া পড়িল। নির্দ্দয় রাজকর্ম্মচারিগণ সেই অজ্ঞানাবস্থাতেই তাহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিল। ক্রমে যখন তাহার চেতনা হইল, তখন সে আপনার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিল। প্রকৃত ঘটনা একে একে তাহার মনে উদয় হইতে লাগিল এবং সে বুঝিল "সে কারাগারে বন্দিনী"। অশ্রুজলে তাহার বক্ষস্থল ভাসিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরিতাপ ও ক্রন্দন করিয়া, মনোরমা কতক সুস্থির হইয়া, বিপদভঞ্জন হরিকে সকাতরে ডাকিতে ডাকিতে শীঘ্রই তৃণশয্যার উপর নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

নিদ্রার কি আশ্চর্য্য শক্তি! পুত্রশোকাতুরা জননী, পতিবিয়োগ-আকুলা সতী, এবং রুগ্ন শয্যায় পীড়িত ব্যক্তিও নিদ্রাভিভূত হইয়া সকল যাতনা ভুলিয়া যান। মনোরমা যতক্ষণ নিদ্রিতা ছিল ততক্ষণ সে তাহার সকল যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়াছিল।

মনোরমা জাগ্রত হইয়া দেখিল রজনী ঘোর অন্ধকারে দিক সকল আচ্ছন্ন করিয়াছে। কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল আমি স্বপ্ন দেখিতেছি না কি? আমি কি সত্য সত্যই কারাগারে বন্দিনী, অথবা আপন গৃহে শয়ন করিয়া স্বপ্ন দেখিতেছি। না, আমার এ স্বপ্ন নহে, এই যে আমার হস্ত "শৃঙ্খলাবদ্ধ" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মনোরমা শয্যার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিল—"এখন আর আমার উপায় নাই, হরি তোমার চরণমাত্র আমার ভরসা, কৃপা করিয়া একবার এই কারাগারের মধ্যে তোমার কন্যার দশা দেখ। তুমি সকলের অন্তর দেখিতে পাও, আমার যে কোন দোষ নাই তাহা তুমি বেশ জানিতেছ। ঠাকুর আমায় এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর। আমার পিতাকে রক্ষা কর, এবং তাঁহার মনে সান্ত্বনা প্রদান কর, তিনি কুশলে থাকিলে আমার অনেক ক্লেশের হ্রাস হয়।" এই কথা বলিতে বলিতে পিতার কথা মনে পড়িয়া তাহার নয়নজল প্রবলবেগে বহির্গত হইতে লাগিল। আর কথা সরিল না, নীরবে রোদন করিতে লাগিল।

শুক্ল পক্ষীয় সপ্তমী তিথির অন্ধকার ক্রমে হ্রাস হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে নয়ন তৃপ্তিকর চন্দ্রের উদয়ে দিক সকল আলোকিত হইল। গভীর রজনী,—জনমানবের সাড়া শব্দ নাই, ঝিল্লিদিগের ঝিঁ ঝিঁ শব্দে চতুর্দ্দিক পূর্ণ, বৃক্ষশাখায় জোনাকি পোকারা উড়িয়া এ ডাল ও ডাল করিতেছে, যেন শত শত মাণিক্য এক স্থানে একত্র হইয়াছে। মাঝে মাঝে কুকুরগুলা ঘেউ ঘেউ করিতেছে। আকাশে নক্ষত্রগণের প্রভা কমিয়া গেল, কেহ কেহ অদৃশ্য হইল। যে মনোরমা অন্য সময় গভীর রজনীতে নিদ্রাভঙ্গের পর আপনাদের গৃহের সম্মুখের বারাণ্ডায় বসিয়া চন্দ্র দর্শন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিত; উন্মুক্ত বায়ু সুগন্ধ বহন করিয়া যে মনোরমার সেবা করিত আজ সে কারাগারে। মনোরমার কারাগৃহের গবাক্ষ দিয়া চন্দ্রালোক গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। মনোরমা সেই আলোর সাহায্যে দেখিল কারা-

গারের দেয়ালগুলি, ঘরের কোণে একটা মাটির ভাঁড় ও একখানা পিতলের থাল, এবং তাহার বিছানাটী কেবল কতকগুলি বিচালিমাত্র।

মনোরমা জানালার কাছে বসিয়া চাঁদ দেখিতে লাগিল, দেখিল চাঁদখানি যেন বেগে ছুটিয়া যাইতেছে, যাইতে যাইতে চাঁদ মনোরমাকে পরিহাস করিবার জন্যই যেন কখনও বা মেঘের ভিতর লুকাইতেছে, আবার মেঘের আর এক দিক দিয়া মুখ বাড়াইতেছে। তৎসঙ্গে সঙ্গে মনোরমাও কখন দুঃখিত ও কখন উল্লাসিত হইতে লাগিল। সে বাল্যকাল হইতে চাঁদ দেখিতে ভালবাসিত সেই জন্য চাঁদ দেখিতে পাইয়া তাহার কারাক্লেশের অর্দ্ধেক বিস্মৃত হইয়া গেল। সে আপনাপনি কহিল "সুধাকর! আমি যেমন তোমায় ভালবাসি তুমিও কি আমায় সেইরূপ ভালবাস। তোমার ভালবাসা আমি বুঝিতেছি, না হইলে এই নির্জ্জন কারাগারে আসিয়া তুমি আমায় এত সুখী করিতে না। তোমায় আজ এত মলিন দেখিতেছি কেন, তুমিও কি আমার দুঃখ দেখিয়া, আমায় বন্দিনী দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছ? আমি যে এই দশায় পড়িয়া এইরূপ ভাবে তোমায় দেখিব তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। তুমি কি বলিতে পার আমার পিতা এখন কোথায় আছেন; তিনি নিদ্রিত না জাগ্রত? তিনিও কি আমার ন্যায় বিলাপ করিতেছেন? ইচ্ছা হইতেছে এখন তাঁহাকে একবার দেখি। চাঁদ! আমার পিতাকে একবার বল আমি তাঁহার জন্য কত ব্যাকুলিত হইয়াছি।"

মনোরমা এইরূপ বলিতে বলিতে হঠাৎ একটী সুন্দর গন্ধ পাইল। একি কোথা হইতে এ গন্ধ আসিতেছে। অনেকক্ষণ পরে সে দেখিল সকালে বাড়ীতে সে যে যুঁইফুল গুলি তুলিয়া কাপড়ের অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, এ তাহারই গন্ধ। মনোরমার কাছে আজ জড়বস্তুগুলি যেন চেতন হইল। তাহারা যেন শুনিতে পায়, সে এইভাবে কথা কহিল, বলিল,—"তোমরা এখন আমার সঙ্গে রহিয়াছ। তোমরাত কোন দোষ কর নি যে কারাগারে আসিবে। তবে কি তোমরা আমায় এত ভালবাস, যে আমার সহিত কারাবাস যাতনা ভোগ করিতেছ। হায় যখন আমি আজ সকালে এই ফুলগুলি তুলিয়াছিলাম তখন কে ভাবিয়াছিল যে অদ্য রাত্রে আমার এই দশা ঘটিবে! যখন রাজকুমারী হেমলতার জন্য মনের মত ফুল দিয়া সাজি সাজাইয়াছিলাম তখন কে মনে করিয়াছিল আজ আমার হস্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ হইবে। বাবা যে সর্ব্বদা বলিতেন পৃথিবীর সমস্তই অলীক ও ক্ষণস্থায়ী, কেবল ঈশ্বরই সত্য, তাহা ঠিক কথা, তখন কথাটী বুঝিতে পারিতাম না—এখন বেশ বুঝিতেছি।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আবার সে কাঁদিতে লাগিল। খানিকক্ষণ বালিকাসুলভ ক্রন্দন করিয়া কতকটা স্থির হইল। সে বাল্যকাল হইতে পিতার কাছে শিখিয়াছিল, যে বিপদে পড়িলে হরিকে ডাকিতে হয়, তাহা হইলে হরি বিপদ ভঞ্জন করিয়া দেন। তাই আজ মনোরমা ক্ষণে ক্ষণে কেবল ঈশ্বরকেই ডাকিতে লাগিল। কত কি বলিয়া ডাকিল তাহার ঠিকানাও নাই—নিয়মও নাই কেবল সরলভাবে বালক ধ্রুবের মত হরিকে ডাকিল। কখনও বা পিতার কথা ভাবিয়া নয়ন জলে আপনার বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া দিল।

এই সময়ে একখানি কাল মেঘে চাঁদটী ঢাকিয়া ফেলিল। মনোরমা আর কিছুই দেখিতে পাইল না। তাহার যে টুকু আনন্দের ভাব

উদিত হইয়াছিল তাহাও নিভিয়া গেল। সে ভাবিল চাঁদ যেমন মেঘের নীচে চিরদিন ঢাকিয়া থাকিবে না নির্দ্দোষীর প্রতি মিথ্যা অপবাদও সেইরূপ অধিক দিন থাকিবে না। দয়াময় হরি অসত্যের আঁধারে সত্যকে আবৃত রাখেন না, পিতার এই কথাটীও ঠিক। আমি যে নির্দ্দোষী নিশ্চয়ই একদিন না একদিন তাহা প্রকাশ হইবে এই চিন্তায় সে মনে বল পাইল।

এইরূপ বিলাপ ও ক্রন্দন করিতে করিতে মনোরমা আবার ঘুমাইয়া পড়িল, আহা তাহার ক্ষুদ্র প্রাণে কত সহ্য হইবে! জগদীশ্বর আর তাহার কষ্ট দেখিতে পারিলেন না। দুঃখহারিণী নিদ্রাকে তাই বালিকার সান্ত্বনার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। মনোরমা প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বে একস্বপ্ন দেখিল যে, সে যেন কোন অভিনব ও রম্য উদ্যানে চাঁদের আলোকে বেড়াইতেছে। বাগানের শোভার কথা বর্ণনা করা যায় না, মনোরমাও এত উজ্জ্বল চাঁদও দেখে নাই। তাহার পিতা সেই বাগানে বেড়াইতেছেন। সে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে—পিতার চরণে পড়িল। পিতা তাহাকে আদর করিয়া তুলিলেন, আর অমনি ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়া দেখে নয়নজলে গণ্ডস্থল প্লাবিত হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত—

ধ্রুবোপাখ্যান।

প্রাচীন কালে এ দেশে উত্তান পাদ নামে এক রাজা ছিলেন। সুনীতি ও সুরুচি নামে তাঁহার দুই রাণী ছিল। বহু বিবাহের জঘন্য প্রথা এখনও এদেশে প্রচলিত আছে। সুনীতি অতি ধর্ম্ম পরায়ণা, পতিব্রতা, ক্ষমাবতী, বিনয়ী, ও সকল গুণবিশিষ্টা; স্ত্রীলোকের যত গুণ থাকিতে হয় সুনীতির তাহা ছিল। সুরুচি অহঙ্কৃত, হিংসুক, উদ্ধত স্বভাব, রাগী, কর্কশ ভাষিনী এবং অভিমানিনী ছিলেন। সুরুচি সুনীতিকে ভাল বাসিতেন না ও তাঁহাকে অতিশয় হিংসা করিতেন;—ও সর্ব্বদাই সুনীতির নামে রাজার কাছে দোষ গাইতেন। কিছুদিন পরে অল্প বুদ্ধি রাজা সুরুচির বশীভূত হইয়া সুনীতিকে অরণ্যে পাঠাইলেন। ইতিপূর্ব্বে নরপতি উত্তান পাদের মহিষী সুরুচির গর্ভে উত্তম ও সুনীতির গর্ভে ধ্রুব নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। সুনীতি সেই প্রাণ ধন ধ্রুবকে দেখিয়া সকল দুঃখ ভুলিয়া অরণ্য মধ্যে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। যখন সুনীতি দুঃখ চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন, তখন ধ্রুব আসিয়া মা, মা, বলিয়া কোলে বসিয়া আধ আধ বাক্যে খেলিবার ঘটনা গুলির পরিচয় দিতেন; সুনীতি বালকের আধ আধ বচনে সকল দুঃখ ভুলিয়া তাহাকে কোলে লইতেন। ধ্রুব পাঁচ বৎসরের হইল। একদিন ধ্রুব ঋষি-কুমারদের সহিত খেলা করিতেছেন এমন সময় একটী বালক বলিল, ভাই ধ্রুব! তুমি উলঙ্গ হইয়া খেলা করিতে আসিয়াছ, আমরা তোমায়

লইয়া খেলিব না; কাপড় পরিয়া এস তবে তুমি খেলিতে পাইবে। তখন বালক বিষণ্ণ বদনে দুঃখিনী জননীর নিকট গিয়া কহিল;—"মা! আমার কাপড় নাই বলিয়া কুমারগণ আমার সহিত খেলা করিবে না, আমার কাপড় দেও।"

সুনীতি আপনার কাপড় হইতে একটু ছিঁড়িয়া দিলেন, সেই কাপড় লইয়া ধ্রুব মাথায় বাঁধিয়া খেলিবার স্থলে গেলেন। ঋষিকুমারগণ দেখিবামাত্র হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, বোকা ছেলে কাপড় কি মাথায় বাঁধে? তখন তাহাদের মধ্যে একজন বলিল এস ধ্রুব আমি তোমায় কাপড় পরাইয়া দি। এই বলিয়া সেই ছেড়া নেক্‌ড়া খানি পরাইতে গিয়া দেখিল সেখানি এত ছোট যে কোন মতে পরান যায় না। সে ধ্রুবকে বলিল, ধ্রুব ইহা অপেক্ষা বড় কাপড় লইয়া আইস। ধ্রুব ছুটিয়া গিয়া বলিল মা, আমায় বড় কাপড় দেও। দুঃখিনী মাতা নিজ কাপড়ের আর একটু ছিঁড়িয়া দিলেন। ধ্রুবও কাপড় লইয়া বালকদিগের নিকটে গেলেন। বালকেরা বলিল তুমি রাজার পুত্র হইয়া কাপড় পরিতে পাওনা; ধ্রুব বলিল ভাই আমার কি পিতা আছেন? আমি ত মা বই কিছুই জানি না। তাহারা বলিল মহারাজ উত্তান পাদ তোমার পিতা; চল তোমার পিতার কাছে যাই তাহা হইলে তিনি উত্তম বসন দিবেন। এই বলিয়া বালকগণ ধ্রুবকে সঙ্গে লইয়া রাজ বাটীতে গমন করিয়া দেখিলেন মহারাজ সুরুচির পুত্র উত্তমকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন। ধ্রুবের সুন্দর মুখ খানি দেখিবামাত্র রাজারও মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। তিনি মনে ভাবিলেন আমি অবিচারে যে শিশু সন্তান সহিত সুনীতিকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলাম এই সেই বালক। আমার অঙ্গ সৌষ্ঠব বালকের মধ্যে অনেক আছে। ইহাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে এই সেই সুনীতির পুত্র। এই মনে ভাবিয়া মহারাজ ধ্রুবকে স্নেহ ভরে কোলে করিবার জন্য বাহু বিস্তার করিলেন। ধ্রুবও পিতার কোলে উঠিতে গেলেন। এমন সময়ে হিংসুক সুরুচি আসিয়া রাগভরে ধ্রুবকে বলিলেন; "অবোধ বালক তুমি অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত হইয়া এ বৃথা উচ্চ মনোরথ করিতেছ কেন? আমার উদরে তুমি জন্ম গ্রহণ না করিয়া তোমার এই বৃথা উচ্চ আশা করা তোমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। তুমি নিতান্তই অবোধ বলিয়া অতি দুর্লভ বিষয়ে আশা করিতেছ; তুমি কি জান না যে সুনীতির উদরে তোমার জন্ম। সত্য বটে তুমি রাজার পুত্র কিন্তু আমি ত তোমায় গর্ভে ধরি নাই। আমার পুত্রের ন্যায় তোমার এরূপ বৃথা আশা কেন।" বিমাতার এই প্রকার হৃদয়-ভেদী কর্কশ বাক্য শুনিয়া তাহার কোমল হৃদয়ে তীক্ষ্ণ শরের ন্যায় বিদ্ধ হইল। ধ্রুব তৎক্ষণাৎ অধোবদনে তথা হইতে প্রস্থান করিল। এদিকে সুনীতি পুত্রের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া অতিশয় চঞ্চলা হইলেন। এমন সময় ধ্রুবকে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতে দেখিয়া সুনীতি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কোলে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস আজ তোমার আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন? কেনই বা অভিমান ও রাগ ভরে আসিলে? কে তোমায় অপমান করিয়াছে? কে তোমায় অনাদর করিয়াছে? "তখন ধ্রুব অভিমানে ফুলিতে ফুলিতে যাহা যাহা ঘটিয়াছে সমস্তই বর্ণনা করিল। অনন্তর ম্লানবদনা দুঃখিত-হৃদয়া সুনীতি উপদেশ বাক্যে পুত্রকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন; "বাপধন! কাঁদিওনা এ পৃথিবীতে মানুষ নিজ কার্য্যের গুণে বড় হয়। যদি বিমাতার কথায় বড় ক্লেশ পাইয়া

থাক তবে পুণ্য লাভ করিবার জন্য যত্ন কর; পুণ্য লাভ করিলে সকল ফল লাভ করিবে।" ধ্রুব জিজ্ঞাসা করিলেন "মা! আমাদের দুঃখ কে নিবারণ করিবে;" সুরুচি বলিলেন—"বাছা! সর্ব্বদুঃখ হারী ভগবান আমাদের দুঃখ দূর করিবেন।" পুত্র জিজ্ঞাসা করিল "ভগবানকে কোথায় পাইব?" জননী বলিলেন "তিনি সর্ব্বত্রই আছেন। যেখানে গিয়া ডাক পাইবে।" এই কথা বলিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার মনে বড় ভয় হইল কি জানি অভিমানে বালক কি করিয়া বসে। এই মনে করিয়া জননী আবার বলিলেন "বাছা! তিনি অরণ্য মধ্যে থাকেন সেখানে কেহ যাইতে পারে না, সে স্থান মনুষ্যের অগম্য।" এই বলিয়া দুঃখিনী সুনীতি পুত্র কোলে করিয়া রজনীতে শয়ন করিলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে সুনীতি নিদ্রাভিভূতা হইলেন। ধ্রুব সেই অবসরে উঠিলেন, উঠিয়া মাতার চরণ বন্দনা করিলেন ও দুঃখিনী মাতাকে না জাগাইয়া কুটীর হইতে নিবিড় বনে গমন করিলেন। অরণ্যে গিয়া ধ্রুব কোথায় দুঃখহারী পরমেশ্বর দেখা দেও, বলিয়া চীৎকার করিয়া আকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। এক একবার ঝড় উঠিতেছে আর ধ্রুব মনে করিতেছেন এই বুঝি আমার হরি। পুরাণে কথিত আছে বালক ধ্রুব সরল প্রাণে অরণ্য মধ্যে এইরূপ বলিতেছেন। হিংস্র জন্তুগণ তাঁহার কাছে আসিয়া তাহার সরলতা দেখিয়া তাহাদের স্বভাব ভুলিয়া কিছু বলিতেছে না। এদিকে সুনীতি নিদ্রাভঙ্গের পর তাঁহার প্রাণের ধ্রুব কাছে নাই দেখিয়া পাগলিনীর ন্যায় ইতস্ততঃ অন্বেষণ আরম্ভ করিলেন। ধ্রুব ধ্রুব করিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এদিকে ধ্রুব কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে নারদমুনি আসিয়া তাঁহার নিকট দেখা দিলেন। তিনি আসিবামাত্র ধ্রুব তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন, তিনি হস্ত উত্তোলন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং বলিলেন "ধ্রুব আমরা এতদিন ধরিয়া তপস্যা করিলাম, আমরা যাঁহাকে পাইলাম না তুমি সামান্য বালক হইয়া তাঁহাকে কিরূপে পাইবে? বৎস! যাহা সিদ্ধ হইবার নয় তুমি সে আশা ত্যাগ কর; তোমার দুঃখিনী মাতার নিকট যাও।" ধ্রুব বলিলেন "প্রভু আমি হরিকে না পাইলে ত গৃহে যাইব না।"

নারদ বলিলেন "তুমি দ্বাদশ বৎসর তপস্যা কর তবে হরিকে পাইবে।" একদিন তপস্যা করিতে করিতে তাঁহার প্রাণের হরি তাহাকে দেখা দিলেন। বালকের এত আনন্দ হইল যে তিনি বাহ্য জ্ঞান রহিত হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, তখন ঈশ্বর তাঁহাকে বলিলেন "বৎস ধ্রুব! তোমার প্রার্থনায় আমি পরিতুষ্ট হইয়া তোমাকে বরদান করিতে আসিয়াছি। এক্ষণে বর প্রার্থনা কর।" বালক দয়াময়ের এই কথা শুনিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া বলিলেন "প্রভু! আমি আর কিছুই চাই না আমার প্রার্থনায় তুমি যদি পরিতুষ্ট হইয়াছ তাহা হইলে আমি ইচ্ছানুসারে তোমার স্তব করিতে পারি ঈদৃশ বরদান কর। কারণ পণ্ডিতেরাও তোমার তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন নাই আর আমি সামান্য বালক হইয়া স্তব করিতে কি করিয়া সমর্থ হইব। হে পরমেশ্বর! আমি যাহাতে তোমার ভক্ত হইতে পারি ও তোমার শ্রীচরণ পূজা করিতে পারি এইরূপ বর প্রদান কর।" দয়াময় ঈশ্বর সদয় হইয়া বলিলেন "বৎস তুমি নয়ন খুলিয়া আমায় বাহিরেও দেখ।" তিনি বলিলেন "না প্রভু আমার ভয় হইতেছে চক্ষু খুলিলে আমি আর তোমায় দেখিতে পাইব না। আমি অনেক

দুঃখে তোমায় পাইয়াছি আর ছাড়িতে পারিব না।" হরি যখন দেখিলেন বালক কিছুতেই চক্ষু খুলিল না তখন তিনি আপনার রূপ লুকাইলেন। ধ্রুব চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া প্রভো কোথায় গেলে বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ পরে নয়ন খুলিয়া দেখেন বাহিরেও হরি বিরাজমান।—

দয়াময় হরি বলিলেন "ধ্রুব তুমি কি চাও", ধ্রুব বলিলেন "প্রভো আমি আর কিছুই চাই না, আমি যখন মনে করিব তখন যেন তোমায় দেখিতে পাই।" ভক্ত বৎসল হরি তথাস্তু বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। ধ্রুব আবার কিছুক্ষণ পরে তাঁহার স্মরণ করিলেন। তিনি আবির্ভাব হইয়া বলিলেন বৎস, "আমায় আবার কেন ডাকিলে?" তিনি বলিলেন "আমি যে মার নিকট যাইতেছি মা যখন জিজ্ঞাসা করিবেন 'কৈ বাছা কি পাইয়াছ' আমি তখন কি বলিব? আমার মাকে তোমার দেখা দিতে হইবে।" তিনি কহিলেন "বাছা! তুমি কঠোর তপস্যা করিয়া আমায় পাইয়াছ, সুনীতি আমায় কিছুই সাধনা করেন নাই। আমি কি করিয়া তাঁহাকে দেখা দিব!" ধ্রুব বলিলেন "না প্রভু তাহা কখনই হইবে না, আমার মাকে দেখা দিতে হইবে।" তিনি তথাস্তু বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। ধ্রুব প্রথমেই রাজবাটীতে গমন করিলেন, তথায় গিয়া প্রথমে বিমাতার চরণে প্রণাম করিলেন; সুরুচি তাঁহাকে দেখিবামাত্র কাঁদিতে কাঁদিতে আপনার দোষ মনে করিয়া ধ্রুবের মুখচুম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপ ধ্রুব! আমি নিতান্ত পাপীয়সী ও নিষ্ঠুরা, আমি তোমার কোমল হৃদয়ে অনেক কষ্ট দিয়াছি। ধ্রুব বলিলেন মা তোমার কিছুই দোষ নাই, তোমার জন্যই আমি হরি পাইয়াছি।

ধ্রুব পিতার চরণে প্রণাম করিলেন, মহারাজ বিলাপ করিয়া কহিলেন ধ্রুব! হায় আমি কি পাপিষ্ঠ! হায় কি নরাধম! কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা শান্ত হইয়া সুনীতিকে আনিতে লোক পাঠাইলেন। সুনীতি রাজসদনে আসিয়া পাগলিনী প্রায় হইয়া কহিলেন আমার হারানধন ধ্রুব কোথায়! আয় বাপ কোলে আয়! মা বলিয়া ডেকে আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর। সুনীতি পুত্রের মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন তবে বাছা তোমার দয়াময় হরিকে দেখাও। ধ্রুব ভগবানের স্তব করিবামাত্র মাতারও জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া গেল। তিনিও সেই দয়াময় হরিকে অন্তরে দেখিয়া কৃতার্থ হইলেন।

সতীশ সকলের অপ্রিয় কেন?

সতীশের বাপ মা বড়লোক, সতীশ তাঁহাদের একমাত্র সন্তান। কিন্তু বড় মানুষের ঘরে একটী মাত্র ছেলে থাকিলে তাহার যেরূপ আদর হয় সতীশ সেরূপ আদুরে ছেলে ছিলেন না। পিতা মাতা যে ছেলেকে আদর করেন না, অন্যলোকে স্বভাবতঃই তাহাকে যত্ন করে না, সুতরাং সতীশ সকলেরই অপ্রিয়। বড়মানুষের ঘরে খাইবার অভাব নাই, পরিবার অভাব

নাই, দাস দাসীর অভাব নাই। সতীশ যখন যাহা চাহিতেন তখনই তাহা পাইতে পারিতেন। কিন্তু সতীশের একটী রোগ ছিল, তিনি খাওয়া পরাতে বড় একটা মন দিতে পারতেন না, অন্যান্য বড়লোকের ছেলেদের ন্যায় দাস দাসীকে কর্কশ কথা কহিতে জানিতেন না, সাজ গোজ করিয়া বড় মানুষের ন্যায় চলিতে ফিরিতে ভাল বাসিতেন না। সতীশের মা সতীশকে ভাল ভাল খাবার দিতেন, সতীশ আপনি অল্প কিছু খাইয়া পাড়ার গরিব ছেলেদের জন্য অবশিষ্ট লইয়া যাইতেন।

সতীশের মা সতীশকে নানা প্রকার বহুমূল্য পোষাক কিনিয়া দিতেন, সতীশ সামান্য ধুতি চাদর জামা পরিয়া বেড়াইতেন এবং কখনো কখনো সেই সামান্য ধুতি জামাও রাস্তার গরিব বালককে দিয়া চাদর পরিয়া ঘরে আসিতেন।

সতীশের মা কাছে বসিয়া এটা খা, ওটা খা, আর একটু দিই ইত্যাদি স্নেহের কথায় সতীশকে ভাল ভাল সামগ্রী খাওয়াইবার চেষ্টা করিতেন, সতীশ এর একটু তার একটু মুখে দিয়া তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিতেন। সতীশের মা চটে লাল। তিনি কখনো রাগ করিয়া সতীশকে গালাগালি করিতেন, সতীশ নীরবে চলিয়া যাইতেন। সতীশের মা যদি কখনো দুঃখ করিয়া বলিতেন "হারে হতভাগা, তোর এমন দশা কেন হলো, তুই কারুর চাকুরী করিস্‌নে, কোন ভাবনা নাই চিন্তা নাই, তবে কেন দুটী খাইবার সময় অমন চঞ্চল হয়ে চলে যাস্‌?" সতীশ প্রায়ই মাতার কথায় কোন উত্তর করিতেন না, তবে মাতার ক্লেশ নিবারণের জন্য বলিতেন, "মা, তোমরা ঘরে থাক, কোথায় কি হইতেছে কোন সংবাদ রাখ না, আমরা দশ যায়গায় যাই, লোকের দুঃখ দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া প্রাণে বড় ক্লেশ পাই। অনেক দূরে যাইতে হইবে না, আমাদের পাড়ার নবীনদের কি কষ্টেই দিন যাইতেছে! নবীন, গোপাল দুইটী ছেলেকে লইয়া নবীনের মা বেচারী কত দুঃখেই দিন কাটাইতেছেন। মা, আমি প্রায়ই দেখি তাঁদের দুবেলা সমানে দুটী ভাত জোটে না। হায়! লোকের শুধু দুটী ভাত জোটে না আর আমরা কত ভাল ভাল খাবার ফেলিয়া ছড়িয়া নষ্ট করি।" এইরূপ বলিতে বলিতে সতীশের মুখ লাল হইত ও চক্ষু জলে পূর্ণ হইত। সতীশের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়াও কিন্তু সতীশের মা সুখী হইতেন না। বালক সতীশের আর একটী দোষ ছিল, তিনি মাছ মাংস খাইতে চাহিতেন না। সতীশের বাবা নিজে মাছ মাংস খাইতে ভাল বাসিতেন। এমন কি অন্যে না খাইলে তাহাকে নানা উপদেশ দিয়া খাওয়াইবার চেষ্টা করিতেন। তিনি ভাবিলেন, সতীশ আজ কালকার নিরামিষ আহারের পক্ষপাতী বাবুদের কথা শুনিয়াই বা এইরূপ করে। তিনি সতীশকে নানা প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, অধিক কি প্রহার করিয়া দেখিলেন, কিছুতেই সতীশের মত ফিরাইতে পারিলেন না। অবশেষে যখন মিষ্টকথায় সতীশের বাবা সতীশের মৎস্য মাংসের প্রতি ঘৃণার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, সতীশ তখন মুখ খানি মলিন করিয়া বলিলেন, "মাছ মাংস খাইতে আমার ক্লেশ হয়, প্রাণের মধ্যে যেন কেমন করে, মাছ মাংস খাইয়া কখনও আমার সুখ হয় না।"

সতীশের বাবা সতীশকে বড়লোকের ছেলেদের সঙ্গে মিশিতে বলিতেন, সতীশ পাড়ার যত সব গরিবলোক, "ছোটলোকের" ছেলেদের

সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের নানা উপকার করিতেন। সতীশের এইরূপ স্বভাব দেখিয়া দিন দিনই তাঁহার বাপ মা বিরক্ত হইতে লাগিলেন, বংশের কলঙ্ক স্বরূপ মনে করিয়া সতীশের বাবা সতীশের বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরাশ ও উদাসীন হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা সতীশকে যে ভাবে মানুষ করিবেন ভাবিয়াছিলেন সতীশ সেরূপ হইতে পারিল না, সতীশের প্রকৃতিই সেরূপ নহে। সতীশের চলন ফেরন, সাজগোজ সকলই সামান্য লোকের ন্যায়। পাড়ার মধ্যে সতীশের বাবা ধনে মানে সকলের চেয়ে বড়লোক, সুতরাং সতীশের এইরূপ ব্যবহারে পাড়ার স্ত্রীলোক পুরুষ সকলেই সতীশের প্রতি বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "হায়রে, সতীশ ছোঁড়াটা একেবারে বয়ে গেল।" ক্রমে সতীশের যত বয়স বাড়িতে লাগিল তত আরো অনেক দোষ বাহির হইতে লাগিল। খুব ভোরে উঠিয়া সতীশের একটু বেড়াইবার অভ্যাস ছিল, স্কুলের ছুটীর পরে কিছু খাইয়া ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিবার নিয়ম ছিল। পাড়ার কুড়ে ছেলেদিগকে সতীশ ভোরে যাইয়া জাগাইতেন এবং সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে যাইতেন। স্কুলের পরে তাস ইত্যাদি কুড়ে খেলায় যে সকল বালক সময় নষ্ট করিত সতীশ তাহাদিগকে লইয়া দৌড়াদৌড়ি খেলিতেন। সতীশের এইরূপ আচরণে কিন্তু পাড়ার লোক চটিয়া উঠিল। "সতীশটা নিজে বয়ে গেছে, পাড়ার ছেলে গুলিরও পরকাল খাইবে" এইরূপ অপবাদ দিয়া পাড়ার অভিভাবকগণ ছেলেদিগকে সতীশের সঙ্গে মিশিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। এইরূপে কি পিতা মাতা, কি প্রতিবাসিগণ কাহারো নিকটে সতীশের আদর নাই। কেবল একজন লোক ছিলেন যাঁহার নিকটে সতীশের অনেক আবদার খাটিত, কেবল একটী স্থান ছিল যেখানে সতীশের অনেক আদর ছিল। সে লোকটী সতীশের স্কুলের মাষ্টার, সে স্থানটী সতীশের স্কুল। নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে যাইয়াই সতীশ স্কুলে উপস্থিত হইতেন। স্কুল বসিবার পূর্ব্বে ছেলেরা প্রায়ই স্কুল কমপাউণ্ডের চারি দিকে খেলা করে। এই খেলায় অনেক সময়ে রক্তপাতও হইয়া থাকে। কিন্তু সতীশের কাছে কখনো অন্যায় হইবার যো ছিল না, সবল দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিবে ইহা সতীশ কখনো সহ্য করিতে পারিতেন না। এজন্য অনেক সময়ে সতীশকে দুর্ব্বল ছেলেদের পক্ষে মারামারি করিতে হইত। অত্যাচারী দুষ্ট ছেলেরা সর্ব্বদাই সতীশের দোষ খুঁজিয়া বেড়াইত, এবং অকারণেও শিক্ষকের নিকটে সতীশকে অপদস্থ করিতে ছাড়িত না। দুষ্ট ছেলেদের স্বভাব এত নীচ যে, তাহারা ক্লাশে বসিয়া এক জন অন্যকে চিম্‌টি কাটিতেছে, আর ছাইমাটি লইয়া সর্ব্বদা ঝগড়া করিয়া শিক্ষককে অস্থির করিয়া তুলিতেছে। অথচ দোষ করিয়া শিক্ষকের নিকটে স্বীকার করিবার সাহস নাই কাজেই একটী দোষ ঢাকিতে দশটী মিথ্যা কথা বলিয়া পার পাইবার চেষ্টা করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না। কিন্তু সতীশের স্বভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে গঠিত। সত্য কথা বলাই সতীশের স্বভাব ছিল, দোষ করিয়া স্বীকার করাই তাঁর অভ্যাস ছিল, এবং সমপাঠী বালকগণের প্রতি সদ্ব্যবহার করা তাঁহার আনন্দ ছিল। সমপাঠী বালকগণের মধ্যে অনেকেই, তিনি সত্যকথা কন বলিয়া, জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই মাষ্টারের নিকটে সকল কথা বলিয়া ফেলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ছিল এবং অনেক সময়ে তাঁহার নামে

মিথ্যা অপবাদ দিত, কিন্তু তিনি কিছুই করিতেন না এবং সর্ব্বদা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া চলিতেন।

পূজার ছুটী হইল। সতীশের বাপ মা পশ্চিম বেড়াইতে যাইবেন, সতীশকেও কাজেই পিতা মাতার সঙ্গে যাইতে হইল। পূজার সময়ে হাবড়ার ষ্টেসনে বড় ভিড়। টিকেট মাষ্টারের বাক্সের সম্মুখে গায় গায় ঘেঁসাঘেঁসি হইয়া লোক দাঁড়াইয়াছে, জোর যার আমল তার। সবল লোক দুর্ব্বল লোককে পেছনে ঠেলিয়া ফেলিয়া আগে টিকেট লইতেছে। যাহাদের পয়সা আছে এবং ঘুশ দিতে বিবেকে বাধিতেছে না তাহারা আগে টিকেট পাইবার আশায় সম্মুখস্থ পাগ্‌ড়ীধারী চাপরাসী মহাশয়দিগকে দুই চারি পয়সা জলপানি দিয়া কাজ সারিয়া লইতেছে। সতীশদের টিকেট লইবার জন্য বাড়ীর গোমস্তা ভিড়ের মধ্যে গিয়াছে, সতীশ ষ্টেসনের ভিতরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতেছেন। টিকেট মাষ্টারের ডান দিকে চাপ্‌রাসী দুই জন দাঁড়াইয়া আছে, কোন ভিড় নাই, যাহারা চাপ্‌রাসী ভায়াদের খুসী করিতেছে তাহাদিগকেই টিকেট মাষ্টারের সম্মুখে সহজে যাইতে দিতেছে, বামদিকে বড় ভিড়। একজনের পরে আর একজনকে যাইতে হইতেছে, এদিকে রেল ছাড়িবারও সময় হইল। একটী স্ত্রীলোক, বোধ হয় তাহার সঙ্গে আর কেহ ছিল না, কোননগর ষ্টেসন পর্য্যন্ত টিকেট করিবে, অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বেচারী চাপরাসীদের নিকট দিয়া টিকেট মাষ্টারের নিকটে যাইতেছিল। চাপরাসীগণ বোধ হয় স্ত্রীলোকের নিকটে পয়সা চাহিয়া থকিবে। কিন্তু চাহিলে কি হইবে স্ত্রীলোকটী শুদ্ধ রেলভাড়ার পয়সা কয়েকগণ্ডা আচলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। স্ত্রীলোক চাপ্‌রাসীর নিকটে হাত জোড় করিয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিল, চাপরাসীদের সে দিকে ভ্রুক্ষেপ নাই, দুই তিন বার চাপরাসীগণ তাঁহাকে গলাধাক্কা দিয়া বাহিরে আনিল। সতীশ এতক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন, আর সহ্য হইল না, তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে চলিয়া গেলেন, সতীশ চাপরাসীগণকে বলিলেন, "ইহাকে যাইতে দেও" চাপরাসীগণ হাসিতে হাসিতে বলিল "দেব না," সতীশ বিরক্ত হইয়াও গম্ভীরস্বরে বলিলেন, ভালচাও ত ছাড়িয়া দাও, অমনি চাপরাসীদের একজনে তাঁহার হাত ধরিবার উপক্রম করিল। সতীশ আত্মরক্ষার্থ তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইলেন ও সজোরে ঐ ব্যক্তির মুখে একটী ঘুষি মারিলেন। চাপরাসী বুঝিল, বালক বলিয়া যাহাকে উপহাস করিয়াছিল সে বালক সামান্য বালক নয়। "পুলিস" "পুলিস" রব উঠিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে পুলিস সবইন্‌স্পেক্টর ষ্টেসন মাষ্টার প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইল। সতীশের বাবাও ষ্টেসনের ভিতরে ছিলেন, তিনিও আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সতীশকে ভিড়ের মধ্যে মিশাইয়া ফেলিবার জন্য চেষ্টা করিলেন, সতীশ বীরেরন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। সতীশের বাবা চাপরাসীদের অত্যাচার ও সতীশের প্রতি আক্রমণের কথা বলিয়া সতীশকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সতীশ ষ্টেসন মাষ্টারের নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। ষ্টেসন মাষ্টার ইংরাজ। সতীসের সত্য কথায় ও সাহসে খুসী হইয়া সতীশকে ধন্যবাদ দিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

এই সকল কারণেই সতীশের বাপমা সতীশের প্রতি বিরক্ত ছিলেন, সতীশের এইরূপ আচরণ দেখিয়াই সতীশের প্রতিবাসিবর্গ সতীশকে "দুরন্ত জেঠা ছেলে" ইত্যাদি বলিয়া গালাগালি করি-

তেন। কিন্তু সতীশের শিক্ষক এই সকল গুণ দেখিয়াই সতীশকে ভাল বাসিতেন। সখার পাঠক পাঠিকাগণ! তোমরা সতীশের বিষয় কি বল?

মশা।

আমরা ছেলে বেলা মশার বাসা খুজিতে যাইতাম। ঢেকী গাছে মশা বাসা করে এই আমাদের বিশ্বাস ছিল। লাল রঙের এক প্রকার বড় পিপড়ে যেমন গাছের পাতা দিয়া বাসা প্রস্তুত করে, ঢেকী গাছে সেই রূপ অতি ক্ষুদ্র বাসা পাওয়া যায়। এ গুলি কিসের বাসা তাহা আমি আজিও জানিতে পারি নাই, কিন্তু আমার ছেলে বেলা এই সংস্কার ছিল যে এ গুলি মশার বাসা বই আর কিছুই নহে। বাস্তবিক এই সকল বাসার প্রায় প্রত্যেকটীতে এক একটী করিয়া মশা পাওয়া যায়।

যে সকল মশা আমাদের রক্ত খাইতে আইসে তাহারা সকলেই স্ত্রী মশা। পুরুষ মশা নিরীহ লোক; সে ফুলের মধু খাইয়া জীবন ধারণ করে। ইহাদের স্ত্রী পুরুষের মুখের গঠনেরও কতকটা তফাৎ আছে।

ডিম পাড়িবার সময় হইলে স্ত্রী মশা উপযুক্ত একটী জলাশয় খুজিয়া লয়। নির্জ্জন পুকুরগুলি এই কার্য্যের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট স্থান। কিন্তু তিন চারিদিন ধরিয়া ঝী যে জলের হাঁড়ি ঘরের কোণে রাখিয়া দিয়াছে, তাহার খোজ পাইলেও মশার মা নিতান্ত দুঃখিত হইবে না। একেবারে অনেক গুলি ডিম পাড়া হইবে। পেছনের দুই খানি পায়ের সাহায্যে ডিম গুলিকে একত্র করিয়া একটী ক্ষুদ্র নৌকার আকারে (১নং) সাজান হইবে; এই নৌকাটী জলে ছাড়িয়া দিলেই সে ভাসিতে থাকিবে। ডিমের সরু দিকটা উপরে থাকে,

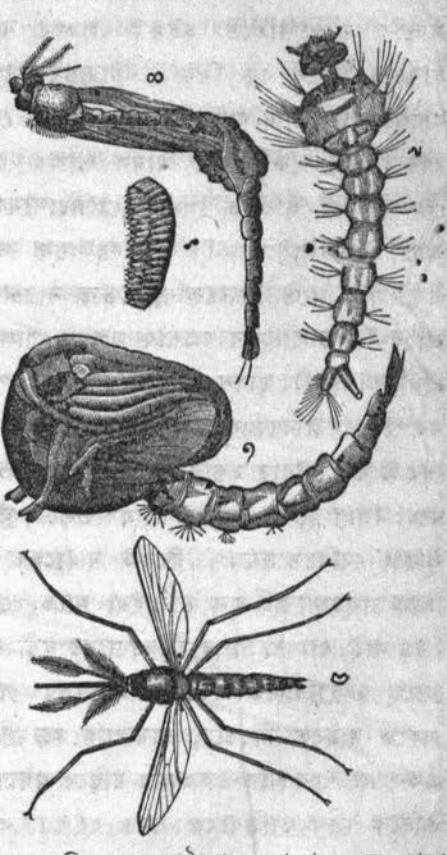

সুতরাং কিরূপে নৌকার আকার হয় তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। উপযুক্ত সময় হইলেই ডিম ফুটিয়া মশার ছানা বাহির হয়। এই সময়ে এ গুলিকে দেখিলে কেহই মনে করিতে পারে না যে, ইহারাই কালে মশা হইয়া মানুষ খাইতে আসিবে। তোমরা নিশ্চয়ই গরমির দিনে স্থির জলে মশার ছানা গুলিকে তিড়িং তিড়িং করিয়া নাচিতে দেখিয়াছ; কিন্তু তাহাদিগকে চিনিতে

পার নাই। ছবিতে যে কতকটা শুঁয়ো পোকার ন্যায় একটা চেহারা (২নং) আঁকা হইয়াছে,তাহাই মশার ছানা। ডিম হইতে বাহির হইয়া ইহারা জলে খেলা করিতে থাকে। ঝী অনেক সময় না দেখিয়া খাবার জলের সহিত গেলাসে করিয়া যে কতগুলি পোকা আনিয়া দেয় তাহা এই মশার ছানা। ইহাদের নিঃশ্বাস ফেলিবার যন্ত্র ল্যাজের কাছে। নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় ল্যাজের অগ্রভাগটী জলের উপরে ভাসাইয়া দিয়া ঝুলিতে থাকে। চোয়ালে এক প্রকার লোম আছে,সেই লোমগুলি কেমন করিয়া যেন জলের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত্ত প্রস্তুত করে। সেই আবর্ত্তে ঘুরিয়া নানা রকমের খাদ্যাখাদ্য আসিয়া মুখের ভিতর পড়ে। মশার ছানা এই উপায়ে জীবন ধারণ করে।

তিনবার চর্ম্ম পরিবর্ত্তনের পর ইহার আর এক প্রকারের আকার(৩নং)ধারণ করে,তাহাতে মশার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি মোটামুটি সকলই বর্ত্তমান থাকে। কিছুকাল পরে পূর্ণাবয়ব মশা(৪,৫নং)ইহার ভিতর হইতে বাহির হয়। খোলসটা জলের উপর ভাসিতে থাকে; মশা তাহারই উপর বসিয়া উড়িবার জন্য যথেষ্ট বল লাভের অপেক্ষা করে। অল্পক্ষণ রোদ বাতাস লাগিলেই তাহার হাত পা শক্ত হয়। তখন সে শূন্যে উড়িয়া অপরাপর সঙ্গীদের সহিত খেলা করে।

মশাগুলি বড় লোভী। গায় বসিবামাত্রই যদি তাহাকে তাড়াইয়া না দেও তবে সে আস্তে আস্তে শুড়টী চামড়ার ভিতর ঢুকাইয়া দিবে। রক্ত খাইতে খাইতে সে এতই আরাম পায় যে শেষে আর তাহার বাহ্যজ্ঞান থাকে না—আমরা এত খাইলে বোধ হয় খবরের কাগজ ওয়ালারা এত দিন আমাদের নাম ছাপিয়া দিত। যখন গায় বসে, তখন দেখিবে যে, তাহার শরীরটী ছুঁচের অগ্রভাগের ন্যায় সরু। ক্ষুধায় তাহার এই দশা হইয়াছে; কিন্তু কিছু কাল তাহাকে খাইতে দাও, দেখিবে শীঘ্রই সে ফুলিয়া উঠিবে, তাহার পেটটী লাল হইয়া আসিবে। এই সময়ে তাহার দুই পাশে আঙুল দিয়া চাপিয়া সেই স্থানের চামড়া টান করিয়া ধরিলেই সে আট্‌কিয়া পড়ে। শুঁড়টী ঢুকাইবার জন্য যে ফুটো করিতে হইয়াছিল চামড়া টান করিয়া ধরিলে সেই ফুটো সরু হইয়া যায়। সুতরাং শুঁড় আর বাহির হইতে পারে না। রাত্রিকালে মশারির ভিতর দুই একটী মশা যোগাড় যন্ত্র করিয়া প্রায়ই ঢুকিয়া যায়। সকাল বেলা আর তাহারা উদর লইয়া চলিতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় অনেক মশাকে ধরিয়া টিপিয়া মারা গিয়াছে।

একটী গল্প বলিয়া শেষ করিতেছি। গল্পটী বোধ হয় সত্য নহে, কিন্তু ইহাতে মজা আছে। কতকগুলি আইরিস সাহেব একবার এদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা কখনও মশা দেখেন নাই, সুতরাং প্রথমে মশারি কিনেন নাই। রাত্রিতে শুইয়াই বুঝিতে পারিলেন যে এদেশের কাণ্ড কারখানা অন্য রকম। অনেক ধমকাইলেন, অনেক বার হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ভয় দেখাইলেন, দাঁত খিচাইলেন কিন্তু মশারা কোন মতেই ভয় পাইল না। অবশেষে লেপদ্বারা সর্ব্ব শরীর ঢাকিয়া কিয়ৎ কালের জন্য নিরাপদ হইলেন। কিছুকাল পরে একজন লেপের এক কোণ সরাইয়া দেখিলেন যে ঘরের ভিতর একটা জোনাকী পোকা আসিয়াছে। দেখিয়াই তিনি "চ্যাঁচাইয়া উঠিলেন" ওরে আর রক্ষা নাই। লেপ মুড়ি দিয়া কি করিবে? ঐ দেখ জানোয়ার গুলির একটা লণ্ঠন লইয়া আমাদিগকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছে!"

নবেম্বর, ১৮৮৬।

কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্র।

অনেক নিষ্ঠুর বালক বালিকা পিতামাতার মনে কষ্ট দিতে ছাড়ে না। পিতামাতার মত স্নেহ জগতে আর কে করে? যাঁহাদের স্নেহ ভিন্ন অসহায় শিশুকালে আমাদের বাঁচিবার কোন উপায়ই ছিল না কত অকৃতজ্ঞ সন্তান অবাধ্য আচরণে ও কটু কথায় সেই পিতামাতার স্নেহময় প্রাণ ভাঙ্গিয়া দেয়! নিজের একটু স্বার্থ ও সুখের ইচ্ছাকে বিসর্জ্জন দিলে তাঁহাদের ক্লেশের ভার যদি একটু লঘু হয় ও তাহা দ্বারা তাঁহাদের প্রাণে যদি একটুকু সুখ আনিয়া দিতে পারি তাহা অপেক্ষা সন্তানের আর সৌভাগ্য কি? কিন্তু পিতামাতা বাঁচিয়া থাকিতে এই কথা স্মরণ রাখিয়া সুসন্তানের কাজ কয় জনে করে? "আমার যতদূর সাধ্য পিতামাতার সেবা করিয়াছি, কোন অপ্রিয় আচরণ দ্বারা কোন দিন তাঁহাদের প্রাণে শেল বিদ্ধ করি নাই" যে পিতৃমাতৃ বৎসল সন্তান মৃত জনক জননীর কথা স্মরণ করিয়া এই কথা বলিতে পারেন, তিনি কি সৌভাগ্যবান! আমরা নিম্নে এক জন বৃদ্ধ ডাক্তারের জীবনের একটী ঘটনার কথা প্রকাশ করিতেছি। পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিয়া পিতৃমাতৃবৎসল সন্তান যে কি আনন্দ অনুভব করেন, ইহা পাঠ করিয়া সখার পাঠক পাঠিকা তাহার পরিচয় পাইবেন।

"বার বৎসর বয়সে একদিন বিকাল বেলা বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছি এমন সময় পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইল। দেখিলাম তিনি একটা পুঁটুলি লইয়া সহরের দিকে যাইতেছেন। আমাকে সেটা দেখাইয়া বাবা বলিলেন 'এইটা অমুক স্থানে লইয়া যাও।' আমি স্বভাবতই অলস-প্রকৃতি ছিলাম, সহজে কোন কাজে যাইতে চাহিতাম না; বিশেষতঃ সেদিন সকাল বেলা হইতে সারাদিন ক্ষেতে কাজ করিয়া বড়ই ক্ষুধার্ত্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। সারাদিনের পরিশ্রমের পর কতক্ষণে বাড়ী পৌঁছিয়া হাত পা ধুইয়া একটুকু ঠাণ্ডা হইব ও আহারের পর পাড়ার আর পাঁচজন ছেলের সঙ্গে আমোদ করিব, উৎসুক হইয়া তাহারই দিকে চাহিয়াছিলাম। বাবা যে স্থানে যাইতে বলিয়াছিলেন তাহা দুই মাইল দূরে। সুতরাং সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর আগুন হইয়া বাড়ী যাইবার সময় বাবা এ নিষ্ঠুর আদেশ করিলেন দেখিয়া বড়ই বিরক্ত হইলাম। 'আমি এখন কোন মতেই পারিব না' অত্যন্ত বিরক্তির সহিত এই কথা বলিতে যাইতেছিলাম,

কিন্তু জানি না কেন হঠাৎ আমার মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল। আমি না গেলে বাবা আপনিই যাইবেন ইহা নিশ্চয় জানিতাম। বাবার দিকে একবার চাহিলাম, তাঁহার প্রশান্ত স্নেহময় মুখ দেখিয়া আমার কঠোর উত্তর মুখেই রহিয়া গেল, 'আচ্ছা বাবা, এখনিই যাইতেছি' বলিয়া প্রফুল্লমুখে পিতার হস্ত হইতে পুঁটুলি লইলাম। সারাদিনের পরিশ্রমের পর অবসন্ন শরীরে তাঁহার আদেশ পালন করিতে আমার এইরূপ আগ্রহ দেখিয়া স্নেহময় পিতা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, তিনি স্নেহপূর্ণ চক্ষে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'তুমি যে আমার কথামত কাজ করিতে যাইবে আমি তাহা পূর্ব্বেই জানিতাম, তুমি কোন দিনই আমার কথার অবাধ্য নও; আমি নিজেই যাইতেছিলাম কিন্তু শরীরটা যেন কেমন করিতেছে, তাই আর পারিয়া উঠিলাম না।'

"বাবা আমার সঙ্গে সঙ্গে সহর পর্য্যন্ত গেলেন ফিরিয়া যাইবার সময় আমার হাতে হাত রাখিয়া আবার বলিলেন 'তুমি চিরদিনই সুপুত্রের কাজ করিয়াছ, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।'

"বাবার কাজ সারিয়া সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিলাম। বাড়ীতে আসিয়া বাহির বাড়ীতে অনেক লোক একত্র হইয়াছে দেখিয়া, কি হইয়াছে জানিতে অগ্রসর হইলাম, যাহা শুনিলাম, তাহাতে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। বাড়ী পৌঁছিয়াই হঠাৎ পড়িয়া গিয়া বাবার মৃত্যু হইয়াছে! যাঁহারা নিকটে ছিলেন তাঁহাদের নিকট শুনিলাম মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার কথা বলিতেছিলেন।

"আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি; কিন্তু সেই দিনের ঘটনা এখনও মনে উজ্জ্বলরূপে অঙ্কিত রহিয়াছে। পিতার এই শেষ কথা এখনও কাণে বাজিতেছে। সেই সময়ে হঠাৎ যদি আমার সুবুদ্ধির উদয় না হইত তাহা হইলে আজ কি ভয়ানক অনুতাপে হৃদয় পূর্ণ হইত। ঈশ্বর-প্রসাদে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে পিতার আদেশ পালন করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে তাঁহার প্রাণে সুখের সঞ্চার করিতে পারিয়াছি, ইহা যখন স্মরণ করি, তখন হইতে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতার উদয় হয় এবং আনন্দে পূর্ণ হইয়া তাঁহাকে শত 'সহস্রবার ধন্যবাদ দি।" ভালবাসার সহিত যে কার্য্য করা যায় তাহার ফল বৃথায় যায় না।

আমার অবাধ্যতায় মৃত জনক-জননী না জানি কত ক্লেশ পাইয়াছেন একথা ভাবিয়া যাহাকে অনুতাপ করিতে হয় তাহার মত দুর্ভাগ্য কে?

তাই বলি পাঠক পাঠিকা! পিতামাতা যে আদেশ করেন নিজের একটুকু সুখ ও আমোদের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও প্রাণে আনন্দ ও অনুরাগ লইয়া তাহা পালন করিতে প্রফুল্লমুখে ছুটিয়া যাইও। স্মরণ রাখিও, যে বালকবালিকা পিতামাতাকে অন্তরের সহিত ভালবাসে ও সেই অনুরাগ বাক্যে ও কার্য্যে প্রকাশ করিতে উৎসুক, ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করেন।

'তুমি চিরদিনই সুপুত্রের কাজ করিয়াছ'

মহাত্মা নেল্‌সনের গল্প।

ঠিক পাঠিকাগণের স্মরণ আছে আমরা ইতিপূর্ব্বে মহাত্মা নেল্‌সনের বাল্যকালের কয়েকটী গল্প বলিয়া দেখাইয়াছি যে, ঐ মহাপুরুষ বাল্যাবস্থাতেই স্বীয় ভাবী মাহাত্ম্যের চিহ্ন অনেক দেখাইয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে আরও দুই চারিটী কথা লিখিয়া তোমাদিগকে দেখাইব যে, একটীমাত্র গুণেই তিনি এত খ্যাতি লাভ করিয়া জগতে অমর হইয়া গিয়াছেন। তোমাদেরও মধ্যে এই বাল্যকাল হইতে যিনি সেই গুণটীমাত্র লাভ ও বর্দ্ধন করিয়া সেই নিয়মের অনুসারে নিশ্চয়ই সব সময়ে কাজ করিতে পারিবেন, তিনিও সেই বীরচূড়ামণি নেল্‌সনের মত আপনার জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করিয়া জীবন সার্থক করিবেন সন্দেহ নাই।

আমেরিকার সঙ্গে ইংলণ্ডের যে মহাসমর হয়, তাহাতে কত লোক বিস্তর ধনোপার্জ্জন করিয়া বড়মানুষ হইয়াছিলেন। কিন্তু নেল্‌সন যে গরিব সেই গরিবই ছিলেন। সেই বিষয়ে কিন্তু তাঁহার নিজের মত বড় চমৎকার ছিল। তিনি বলিতেন—"আমি দরিদ্র আছি সত্য, এত বড় যুদ্ধের পরেও ধনী হইতে পারিলাম না বটে, কিন্তু এই যুদ্ধ উপলক্ষে আমার চরিত্রে এক বিন্দুও কলঙ্ক পড়ে নাই। আমার চিরকাল বিশ্বাস যে প্রকৃত পবিত্র জীবনে উপার্জ্জিত যে যশ, তাহা ধনরাশি অপেক্ষা অনেক মূল্যবান।" বীর-যুবক বাল্যকালে যে দৃঢ়তার সহিত স্বীয় কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়াছিলেন চিরদিনই সেই কর্ত্তব্যনিষ্ঠা (যাহা ঠিক উচিত বলিয়া বুঝিব তাহাই করিব, যা ঘটে ঘটুক) দেখাইয়া গিয়াছেন।

নেল্‌সন যখন বোরিয়াস্ নামক জাহাজের কাপ্তেন (অর্থাৎ সর্ব্বোপরি কর্ত্তা) হইয়া আমেরিকা যান, তখন এক আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল। আণ্টিগোয়া নামক এক বন্দরে গিয়া দেখিলেন যে, একখানা জাহাজের মাস্তুলে একটা চওড়া নিশান উড়িতেছে। চওড়া নিশান কিসের চিহ্ন জান?—সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতার চিহ্ন। সেই বন্দরে যতগুলি জাহাজ ছিল, তাহাদের কোনটীর কাপ্তেনই নেল্‌সনের অপেক্ষা ক্ষমতায় উচ্চ নহেন, বরং সকলেই তাঁহার নিম্নে। তাঁহার উপরে কেবল প্রধান নৌ-সেনাপতি সার রিচার্ড হীউস্, তিনিও সেখানে থাকিতেন না। সুতরাং হিসাব মত সে বন্দরে নেল্‌সনেরই ক্ষমতা সর্ব্বোপরি। অথচ আর একখানি জাহাজে সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতার চিহ্ন চওড়া নিশান দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইলেন এবং ব্যাপার কি জানিবার জন্য "কম্যাণ্ডার-ইন্-চীফ্" বা প্রধান নৌ-সেনাপতি সার রিচার্ডকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। তিনি উত্তরে লিখিলেন যে, ঐ স্থানের শাসনকর্ত্তা মাউট্রে সাহেবের অধীন হইয়া তাঁহাকে চলিতে হইবে। এবং ঐ বন্দরে মাউট্রে সাহেবের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতা অধিক থাকার চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে যে কোন জাহাজে ইচ্ছা, চওড়া নিশান উড়াইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

নেল্‌সন তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন যে, মাউট্রে সাহেবের ঐ নিশান উড়াইবার কোন ক্ষমতা নাই, এবং তাঁহার উপর হুকুম চালাইবার কোন অধিকার নাই। এমন কি তোমরাও স্পষ্ট বুঝিতেছ যে, যখন ঐ বন্দরে নেল্‌সন সকল কাপ্তেনেরই

উপরে, তখন ঐ স্থানীয় শাসনকর্ত্তার কোন অধিকার নাই যে, তাঁহার উপরে ক্ষমতা চালান; অথচ নেল্‌সনের উপরওয়ালা প্রধান সেনাপতি তাঁহাকে আদেশ করিলেন—মাউট্রের হুকুম শুনিতে হইবে। তিনি কি করেন? যে সে লোক হইলে হয়ত সে আদেশ অমান্য করিতে সাহসী হইত না। কিন্তু নেল্‌সন বেশ জানিতেন যে, তিনি নিজ কর্ত্তব্য-বুদ্ধি ভিন্ন আর কাহারও অধীন হইবেন না। সুতরাং অসম সাহসের সহিত বন্দরে প্রবেশ করিবামাত্র ঐ জাহাজের কাপ্তেনকে তৎক্ষণাৎ চওড়া নিশানটা নামাইয়া ডক্‌ইয়ার্ডে (জাহাজ মেরামতের ও সব সামগ্রী রাখিবার স্থান) পাঠাইয়া দিতে আদেশ করিলেন। সার রিচার্ড আপনার অধীনস্থ কর্ম্মচারীর অবাধ্যতায় ক্রুদ্ধ হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট করিলেন। কিন্তু পরে নেল্‌সনেরই জিৎ হইল। ঐ অন্যায় আদেশ পালন না করার জন্য তিনিই প্রশংসা পাইলেন।

আরও একটা গল্প বলি শুন। তখন ইংলণ্ডের বাণিজ্য আইনে লেখা ছিল যে, কোন বিদেশীয় জাহাজ বা মাহাজন আমেরিকার ইংরাজ ঔপনিবেশিক দ্বীপসমূহে ব্যবসায় চালাইতে পারিবেন না। আমেরিকায় ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ দেশ আগে ইংরাজদেরই ছিল, কিন্তু ঐ মহাসমরে তাহারা স্বাধীন আমেরিকান্ হয়। সুতরাং তাহারা হিসাবমত এখন "বিদেশীয়" হইয়াছে। কিন্তু তথাপি তাহাদের জাহাজ সকল পূর্ব্বের মত ইংরাজদিগের দ্বীপগুলিতে গিয়া বাণিজ্য করিত। নেল্‌সন দেখিলেন যে, তাহা আইন-বিরুদ্ধ কাজ হইতেছে। তিনি প্রধান নৌ-সেনাপতির নিকটে গিয়া সে কথা বলিলেন। প্রথমে তিনি উড়াইয়াই দিয়াছিলেন। কিন্তু নেল্‌সন ত আর ছেলে ভুলানতে ভুলিবার নন, তাঁহার নিকটেই আইন ছিল, খুলিয়া তখনি দেখাইয়া দিলেন যে, আমেরিকানদিগকে দূর করিয়া না দিলে কর্ত্তব্য করা হয় না, দোষ হয়।—সার রিচার্ড কি করেন?—অগত্যা বাধ্য হইয়া তাঁহার কথায় সম্মত হইলেন।

তখন নেল্‌সন আসিয়া ঐ সকল দ্বীপের শাসনকর্ত্তাকে ঐ কথা বলিলেন। কিন্তু বালকবৎ কাপ্তেনকে অগ্রাহ্য করিয়া তিনি তাঁহাকে উপহাস করায়, সিংহশাবক অমনি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"দেখুন, আমি বালক হইতে পারি, কিন্তু ইংলণ্ড মহাসাম্রাজ্যের কর্ণধার প্রধান মন্ত্রী পীট (যাঁহার বয়স এখন ২৫ বৎসর) তাঁহার অপেক্ষা আমার বয়স কম নহে। আর তিনি যেমন এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করিতে পারেন আমিও তেমনি দক্ষতার সহিত একখানি রণতরীর অধ্যক্ষতা করিতে সমর্থ।" এই বলিয়া ২৬ বৎসরের যুবা ঐ বৃদ্ধের মুখ চুণ করিয়া দিলেন।

তারপর, একটী দিন ধার্য্য হইল ও আজ্ঞা প্রচারিত হইল যে, ঐ দিনের পর যে আমেরিকান জাহাজ ইংলণ্ডীয় বন্দরে দেখা যাইবে তাহাই গ্রেপ্তার করা হইবে। দ্বীপবাসী সমস্ত লোক একবাক্যে তাঁহার বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি করিয়া উঠিল, শাসনকর্ত্তারাও সকলেই (একজন ছাড়া) তাঁহার বিপক্ষে দাঁড়াইল। মহা হুলস্থূল ব্যাপার। গতিক মন্দ দেখিয়া দুর্ব্বলচেতা ভীরু সার রিচার্ড চুপে চুপে নেল্‌সনকে পত্র লিখিলেন যে, সকলের মত লইয়া ও খুসী করিয়া যেন কার্য্য করা হয়। কিন্তু কর্ত্তব্য-পরায়ণ বীর নেল্‌সন অচল, অটল, হিমালয় পর্ব্বতের মত দৃঢ় হইয়া আপনার মতানুসারে স্বতেজে চলিতে লাগিলেন।

এদিকে প্রধান সেনাপতি সার রিচার্ড আপনার পত্র অগ্রাহ্য হইল দেখিয়া কড়া হুকুম বাহির

করিলেন যে, নেল্‌সন যেন আমেরিকান্ জাহাজ সকলের বিরুদ্ধে কোন কিছু না করেন। তাহারা পূর্ব্ববৎ বাণিজ্য করিতে পাইবে। তিনিই সকলের উপর ক্ষমতাশালী। তাঁহার এই প্রকাশ্য আদেশ অমান্য করিলে নেল্‌সনের যার পর নাই বিপদের সম্ভাবনা। এই আদেশ প্রচারিত হইলে শাসনকর্ত্তারাও খুব জোর পাইয়া তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়া বিদ্রূপাদি করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কর্ত্তব্য-পরায়ণ বীর-হৃদয় টলিবার নহে। তিনি এবারেও আপনার উপরওয়ালার স্পষ্ট আজ্ঞার বিপরীত কাজ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন। বলিলেন, "হয় আমার অধিনায়ক সার রিচার্ডকে অমান্য করিতে হইবে, না হয়ত আমার দেশের আইন অমান্য করিতে হইবে। আমি কখনই কর্ত্তব্য ত্যাগ করিতে পারিব না। যা হয়, হউক।" তাহার পর সার রিচার্ডকে বিনম্রভাবে লিখিলেন "আপনার আদেশ অমান্য করাই এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে। পরে সাক্ষাৎ হইলে বুঝাইয়া দিব যে আমি অতি ঠিক কাজ করিতেছি।" স্থূলদর্শী সার রিচার্ড কর্ত্তব্য-প্রিয় বীরের এই কথার মহত্ব কি বুঝিবে? প্রথমে রাগে অন্ধ হইয়া তাঁহাকে বিচারাধীনে আনিয়া শাস্তি দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, পরে বুঝিতে পারিয়া আবার নেল্‌সনকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন।

তারপর কি হইল শুনিবে? গায় কাঁটা দিতেছে। উক্ত নির্দ্ধারিত দিনের পরেও অনেক আমেরিকান জাহাজ ঐ বন্দরে ছিল তাহারা ধৃত ও বাজেয়াপ্ত হইল। অবশেষে নেল্‌সন স্বয়ং চারিখানি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আমেরিকান জাহাজ মাল বোঝাই শুদ্ধ দেখিতে পাইয়া ভদ্রতাপূর্ব্বক তখনি না ধরিয়া ৪৮ আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে বন্দর ত্যাগ করিয়া যাইবার আদেশ দিলেন। কিন্তু দুষ্ট কাপ্তেনেরা তাহা না শুনিয়া আবার বলিল যে, তাহারা আমেরিকান জাহাজ নয় তখন অগত্যা নেল্‌সন তাহাদের কয়েকজন নাবিকের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া আমেরিকান ধার্য্য হওয়ায় চারি খানি জাহাজই আটক করিলেন। এই বার মহা প্রলয় উপস্থিত হইল। সমস্ত অধিবাসী, শাসন কর্ত্তারা, ব্যবসাদারেরা এবং বাণিজ্যাগারও (Custom House) সব এক বাক্যে তুমুল কোলাহল উত্থিত করিল। নেল্‌সনের নামে ৪,০০,০০০ চারি লক্ষ টাকা লোকসানের দাবী দিয়া জাহাজনেরা নালিশ করিল। সর্ব্বনাশ! কি উপায়? ভীরু সার রিচার্ড এবারেও তাঁহাকে সমর্থন করিলেন না, দূরে থাকিয়া কি হয় দেখিতে লাগিলেন। ভীম সাহসে নেল্‌সন আপনার পক্ষ সমর্থন করিলেন। এবং এমন স্বাধীন ও নির্ভীক হৃদয়ে শান্ত ও গম্ভীর ভাবে এবং এমন দৃঢ়তা ও দক্ষতার সহিত মকদ্দমা চালাইলেন যে তাঁহারই জয় লাভ হইল।

পৃথিবীতে চিরকালই কর্ত্তব্যপরায়ণ সত্যনিষ্ঠ লোকেরা এইরূপে জয়ী হইয়া আসিয়াছেন। কর্ত্তব্য ঈশ্বরের আদেশ। এই আদেশের উপরেই যিনি জীবনকে দাঁড় করাইতে পারেন তিনিই বীর, নির্ভয়, নিরাপদ ও জয়ী।

মুদ্রাযন্ত্র।

চীনেদের বড় বুদ্ধি। গ্রাম্য লোকদিগের অনেকে এখনও বিশ্বাস করে যে ষ্টীম্ এঞ্জিন্, টেলিগ্রাফ্ ইত্যাদি বড় বড় কল কারখানা সব চীনেদের তৈরী। বাস্তবিক চীনেদের সম্বন্ধে লোকের এরূপ বিশ্বাস হইবার কারণ আছে। পূর্ব্বকালে যখন অন্যান্য দেশের লোকেরা এসব বিষয়ের কিছু জানিত না, তখন চীনেরা অনেক রকম কল ও সঙ্কেত জানিত। তখন যাহা কিছু আশ্চর্য্য হইত, প্রায় সবই চীনেরা প্রস্তুত করিত। এইরূপেই চীনেদের এরূপ নাম হইল।

যে ছাপাখানা দ্বারা পৃথিবীর এত উপকার হইয়াছে, তাহারও প্রথম মতলবটা চীনেদেরই মাথায় খেলিয়াছিল। গল্প আছে খ্রীষ্টিয় দশম শতাব্দীতে চীন রাজমন্ত্রী ফুং তেও প্রথম ছাপিবার সংকেত আবিষ্কার করেন। অনেক হুকুম, ঘোষণাপত্র ইত্যাদি এত অধিকবার লিখিতে হইত এবং তাহাতে এত অধিক সময় লাগিত যে, তাহাতে রাজকার্য্য সুন্দররূপ চলিবার বড়ই ব্যাঘাত হইত। সুতরাং তিনি মনে করিলেন যে, ইহা অপেক্ষা সহজ উপায় একটা বাহির করা আবশ্যক। তিনি দেখিলেন যে সেই সকল হুকুম কাঠে খোদাই করিয়া, তাহাতে কালী দিয়া তাহা হইতে ছাপ তুলিলেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। এইরূপে তিনি মুদ্রাঙ্কণের মূলমন্ত্র আবিষ্কার করিলেন। সেই সময়ে পী চিং নামক একজন কর্ম্মকার বাস করিত। সে দেখিল যে মস্ত একটা হুকুম কাঠে খোদাই করার চাইতে আলাদা আলাদা অক্ষর খোদা থাকিলে সেইগুলি আবশ্যক মত একত্র করিয়া অতি সহজেই কাজ চালান যাইতে পারে। সে মাটির অক্ষর তৈরী করিয়া তাহাদ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিল যে পৃথক অক্ষর রাখিলে বেশ কাজের সুবিধা হয়। কিছুদিন পরে পী চিং মরিয়া গেল। তাহার ছেলেদের বুদ্ধি আর ত ততটা পাকা হয় নাই, সুতরাং তাহারা মনে করিল যে বাবা কি ছেলেখেলা নিয়াই জীবনটা কাটাইয়া গিয়াছেন! এই ভাবিয়া তাহারা পী চিঙের অক্ষরগুলি ফেলিয়া দিল। শীল মোহরের গোছ করিয়া কাঠ খোদাই করা ভিন্ন ছাপার কার্য্যের আর অধিক উন্নতি চীনেদের দ্বারা হইল না।

জর্ম্মণি দেশে গুটেন্‌বর্গ নামক একজন লোক ছিলেন; তিনিই প্রকৃত পক্ষে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার করেন। তিনিও প্রথমে খোদাই করা কাঠ হইতেই ছাপ তুলিতেন। ফষ্ট্ নামক এক ব্যক্তি গুটেন্‌বর্গের আবিষ্কারে বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাঁহার সহিত যোগ দিয়া এই কার্য্যে তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরেই গুটেন্‌বর্গ বুঝিতে পারিলেন যে হাতে ছাপ না তুলিয়া ছাপ তোলার জন্য কোনরূপ যন্ত্র থাকিলে বড়ই ভাল হয়। তিনি একটী যন্ত্রের কথা ভাবিয়া কনরেড্ সাম্প্যাক্ নামক একজন ছুতোরকে বলিলেন। সে তাঁহাকে এক কাঠের ছাপাখানা প্রস্তুত করিয়া দিল। এই ঘটনার দুই বৎসর পরে (১৪৩৮ খ্রীষ্টাব্দে) কষ্টার নামক একজন লোক প্রথমে পৃথক অক্ষরের সৃষ্টি করিলেন। এইরূপে প্রকৃত প্রস্তাবে মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হইল। সর্ব্বপ্রথমে তাঁহারা বাইবেল গ্রন্থ ছাপিতে আরম্ভ করেন। এই প্রথম মুদ্রাঙ্কিত গ্রন্থ এখন অতি দুষ্প্রাপ্য হই-

য়াছে। অল্পদিন হইল নিউইয়র্ক নগরে (আমেরিকায়) ইহার একখণ্ড নিলামে বিক্রয় হইয়াছিল; তাহার মূল্য ১৮০০০৲ আঠার হাজার টাকা হইয়াছিল।

ইংরাজেরা জর্ম্মণদের নিকট হইতেই এই বিদ্যা লাভ করেন। উইলিয়ম ক্যাক্‌ষ্টন্ নামক একব্যক্তি কলোন্ নগরে আসিয়া ছাপার কাজ শিক্ষা করেন। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলে ইংলণ্ডের রাজা ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে একটী ছাপাখানা স্থাপন করিতে অনুমতি দেন। ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার এবি নামক গীর্জাতে সেই ছাপাখানা স্থাপিত হয়।

ইংলণ্ডে ক্যাক্‌ষ্টনের যে গৌরব, আমাদের দেশে মহাত্মা কেরীরও সেই গৌরব হওয়া উচিত। কেরী সাহেবই প্রথমে এদেশে ছাপাখানা আনয়ন করেন। তাঁহারই যত্নে প্রথম বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত হইল। শ্রীরামপুরে প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয়। তখনকার ছাপা এখন দেখিলে হয়ত তোমরা হাসিবে। আমি বহুকালের পুরাতন একখানি অভিধান দেখিয়াছি। তাহাতে বাঙ্গালা শব্দের ইংরাজি অর্থ লেখা আছে। অভিধানখানি ঠিক ওয়েব্‌ষ্টারের বড় ডিক্সনারির ন্যায় বড় হইবে। ইহার বাঙ্গালা অক্ষরগুলি দেখিতে হাতের লেখা অক্ষরের মত, কিন্তু বেশ পরিষ্কার। এখন অক্ষরের অনেক উন্নতি হইয়াছে; কিন্তু এক কথা মনে রাখিও, কেরী সাহেবের নিকট আমরা এই সকলের জন্য ঋণী।

আজ কাল ছাপাখানার কিরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহা আমাদের দেশের দুই একটী প্রেস দেখিয়া বুঝিতে পারিবে না। নিম্নে প্রধান পাঁচটী ছাপার কলের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে—

১। ম্যারিননির কৃত। এই কল প্রতি ঘণ্টায় ১৫০০০ হইতে ২০,০০০ করিয়া ছাপে।

২। জুলিস্ ডেরীকৃত। এই কল প্রতি ঘণ্টায় ১৬০০০ হইতে ৩২০০০ করিয়া ছাপে।

৩। হো সাহেব কৃত। আমেরিকার তিনটী প্রধান খবরের কাগজ ছাপিতে এইরূপ তিনটী কল ব্যবহৃত হয়। এই কল খবরের কাগজ ছাপিয়া কাটিয়া আঠা দিয়া জুড়িয়া এবং ভাঁজ করিয়া দেয়। এবং এত কাজ করিয়াও ঘণ্টায় ২৫০০০ হিসাবে ছাপে।

৪। এলুজে কোম্পানির প্রেস। এই প্রেসে ঘণ্টায় ৩৫০০০ হইতে ৭০,০০০ করিয়া ছাপা হইতে পারে।

৫। স্কট্ রোটারি প্রেস। ইহাতে ঘণ্টায় ৩০,০০০ হিসাবে ৮ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট কাগজ ছাপা কাটা ও ভাঁজ করা হয়।

স্নেহলতার দয়া।

বৈশাখ মাস। দারুণ গ্রীষ্ম, রৌদ্রের তেজে চারিদিক যেন অগ্নিময় হইয়াছে; কাহারও ঘরের বাহির হইবার সাধ্য নাই। এমন সময় ঐ দেখ রাস্তায় একটী স্ত্রীলোক দুটি ছেলে সঙ্গে লইয়া চলিয়াছে। এত রৌদ্রে, এই দুই প্রহরের সময় ইহারা কোথায় যাইতেছে? আর সকলের মত ঘরে না থাকিয়া ইহারা এমন সময় কেন বাহির হইয়াছে? আবার চাহিয়া দেখ স্ত্রীলোকটীর মুখখানি নিতান্ত মলিন হইয়া গিয়াছে, চক্ষু দিয়া অনবরত জল পড়িতেছে। কেন, ইহাদের কি কোন বিপদ ঘটিয়াছে? হাঁ, ইহাদিগের নিতান্তই বিপদ। কিছুদিন হইল ঐ স্ত্রীলোকটীর স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। ইহাদিগের অবস্থা বড় ভাল ছিল না। স্বামী যাহা উপার্জ্জন করিত তাহাতে কোন মতে দিন চলিয়া যাইত, তাহার মৃত্যু হওয়াতে ইহারা নিতান্ত বিপদে পড়িয়াছে। ইহাদিগের আর কেহ এমন নাই যে খাইতে পরিতে দেয়, বা অন্য প্রকারে সাহায্য করে।

ডিসেম্বর, ১৮৮৬।

জানোয়ারের বুদ্ধি।

আর একটী হাতির বুদ্ধির কথা শোন। একটী হাতির একজন মাহুত ছিল। সে মাহুত সস্ত্রীক হাতির কাছেই থাকিত। মাহুতের স্ত্রী হাতিকে ভাল বাসিত, হাতিও তাহাকে ভাল বাসিত। একবার মাহুত আপনার স্ত্রীর সহিত ঝগড়া করিয়া একদিন রাত্রে তাহাকে মারিয়া ফেলিল, এবং তাহার মৃত দেহ নিকটেই একস্থানে পুতিয়া রাখিল। দুই এক দিনের মধ্যেই আর একটী স্ত্রীলোককে বিবাহ করিবে বলিয়াই বোধ হয় পূর্ব্ব স্ত্রীকে মারিয়াছিল। যাহা হউক সে নূতন স্ত্রীকে আনিয়া হাতির সহিত প্রথমে পরিচয় করিয়া দিল। বলিল এই তোর স্বামিনী, তুই ইহার কথা মান্য করিস্। হাতি সেই হত্যা কাণ্ড স্বচক্ষে দেখিয়াছিল; সুতরাং সে যখন নবাগত স্ত্রীকে পরিচয় করিয়া দিতেছিল, তখন হাতি মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইয়াছিল। কিন্তু তখন কিছু বলিল না। পরে মাহুত যখন বাহিরে গেল, তখন হাতি সেই স্ত্রীলোককে একেলা পাইয়া তাহাকে শুঁড় দিয়া ধরিল ও টানিয়া লইয়া তাহার পূর্ব্ব স্ত্রীকে যেখানে গোর দেওয়া হইয়াছিল সেখানে লইয়া গেল, এবং দন্তের দ্বারায় গোর খুঁড়িতে লাগিল। খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া মৃত শরীরটী বাহির করিয়া সেই স্ত্রীলোকের সমক্ষে ফেলিয়া দিল। হাতির বাক্‌শক্তি থাকিলে হয়ত বলিত "দেখ্ নির্ব্বোধ স্ত্রীলোক, কিরূপ পুরুষকে বিবাহ করিয়াছিস্।"

তোমরা জান ইংরজেরা কুকুরকে বড় ভাল বাসে। সাধে কি এত ভালবাসে, কুকুরের মত প্রভুর উপকারী বন্ধু মানবের অতি অল্পই আছে। তবে একটী কুকুরের গল্প শুন। স্কট্‌লণ্ড দেশের নাম কি শুনিয়াছ, নিশ্চয়ই শুনিয়াছ, স্কট্‌লণ্ড দেশ ইংলণ্ডের উত্তরে। তোমরা ম্যাপ খুলিয়া দেখিবে। স্কট্‌লণ্ড দেশ পর্ব্বতময়। সেখানকার মেষপালকদিগকে পাহাড়ের উপরে মেষ চরাইতে হয়। একবার স্কট্‌লণ্ডের একজন মেষপালক এক পাহাড়ের উপরে মেষ চরাইতে গিয়াছিল তাহার সঙ্গে একটী কুকুর ও তাহার একটী ৪ চারি বৎসরের ছেলে ছিল। সে ব্যক্তি মেষ-চরাইতেছে, ছেলেটি কুকুরের সহিত খেলা করিতেছে এমন সময়ে হঠাৎ কুয়াসাতে দিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ইংলণ্ড স্কট্‌লণ্ড প্রভৃতি শীত প্রধানদেশে সময়ে সময়ে এইরূপ হঠাৎ কুয়াসা হইয়া থাকে। তখন আর পথ ঘাট দেখিতে পাওয়া যায় না। কুয়াসা কয়েক ঘণ্টা থাকে,

পরে কাটিয়া যায়। সেদিন্ কুয়াসা হইয়া একেবারে পাহাড় ছাইয়া ফেলিল। সে ব্যক্তি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কুকুরটীকে সঙ্গে করিয়া মেষ খুঁজিতে গেল। ছেলেটীকে একটী স্থানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া গেল। মেষ খুঁজিয়া সংগ্রহ করিতে তাহার কিছুক্ষণ বিলম্ব হইল। আসিবার সময় কুয়াসা এত গাঢ় হইয়াছে যে, আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। ছেলেরও সাড়া শব্দ নাই। নাম ধরিয়া সেই ঘন কুয়াসার মধ্যে বার বার ডাকিতে লাগিল। উত্তর নাই, অবশেষে ভাবিল, বাড়ী ত নিকটে, যদি হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া বাড়ী গিয়া থাকে। তাড়াতাড়ি বাড়ীতে গিয়া দেখে সেখানেও নাই। তখন সর্ব্বনাশ! রাত্রি সমাগত, কোথায় অন্বেষণ করে। তাহার স্ত্রী আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল। ক্রমে জানিতে পারিল কুকুরটীও পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসে নাই। দুশ্চিন্তার ও মনের ক্লেশে রাত্রি পোহাইয়া গেল। রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র শোকার্ত্ত পিতা আবার শিশুর অন্বেষণে বাহির হইল। পাহাড়ে পাহাড়ে, ঝোপে জঙ্গলে, গুহাতে খুঁজিয়া বেড়াইল; কোন স্থানে পুত্রের সন্ধান পাইল না। নিরাশ মনে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল; আসিয়া শুনিতে পাইল যে, কুকুর তাহার আহারের সময়ে যথাকালে কোথা হইতে আসিয়াছিল, নিজের খাবার খাইয়া চলিয়া গিয়াছে। সমস্ত দিন কুকুরটীর দেখা সাক্ষাৎ নাই, মেষপালক শিশু অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে। আর এক রাত্রি দুঃসহ যাতনায় কাটিয়া গেল। পরদিন প্রাতে আবার সেই অনুসন্ধানে বাহির হইল। তাড়ি বিতাড়ি করিয়া খুঁজিতে লাগিল। কোন স্থানেই উদ্দেশ পাওয়া গেল না। আর একদিন কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিন প্রাতে মেষপালক মনে করিল যে, সে দিন আর বাহিরে যাইবে না, কুকুর খাইয়া কোথায় যায় দেখিতে হইবে। সে দিন প্রাতে কুকুর যথা সময়ে খাইতে আসিল, কিন্তু তাহার প্রভু দেখিল যে, সে সমুদয় খাবার না খাইয়া বড় একখান রুটি খণ্ড মুখে করিয়া লইয়া চলিয়াছে। তখন সে সঙ্গে সঙ্গে চলিল। গিয়া দেখে শিশুটী পাহাড়ের অনেক শত হাত নীচে গড়াইয়া পড়িয়া এক গুহার মধ্যে আশ্রয় লইয়া আছে। সেখানে নিরাপদে এক পাথরের উপরে বসিয়া কুকুরের দত্ত রুটী খণ্ড খাইতেছে। তখন তাহার কি আনন্দ হইল! কুকুর! তোমার এই গুণ সকল মানুষের নাই!

পরেশ ও তাহার পিতা।

পরেশদের বাটীর সম্মুখস্থ বাগানটী নানাবিধ ফুলের গাছে সুসজ্জিত। মধ্যস্থলে খানিকটা গোলাকার খালি জমি; তাহাতে নূতন দুর্ব্বাঘাস সবুজ মখমলের ন্যায় শোভা পাইতেছে; দেখিলেই তাহার উপর শুইয়া পড়িতে ইচ্ছা করে। বাগানের পরেই দোতালা বাড়ী। তাহার আলিসা ও জানালার সম্মুখের কার্নিস সমস্ত ফুলের টব

দিয়া সাজান। বাহির দরজার উপরে যে জানালা, তাহার সম্মুখের টবটী চীনামাটি দ্বারা নির্ম্মিত ও অতি সুন্দররূপে চিত্রিত। ইহাতে একটী গোলাপ ফুলের গাছ। উহা যে সে গোলাপ নহে; উহার ফুল খুব বড় বড় এবং তাহার গন্ধ অতি চমৎকার। পরেশের বাপ অনেক মূল্য দিয়া এই গোলাপ গাছশুদ্ধ টবটী কিনিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেশের জন্মদিন উপলক্ষে তাহাকে উপহার দিয়াছিলেন। সুরেশ এই গাছটীকে অত্যন্ত যত্ন করিত; যখন ইহার কুঁড়ি ধরিত তখন সুরেশের কতই আহ্লাদ! কতদিনে ফুল ফুটিবে সুরেশের মন তাহার জন্য উৎসুক হইয়া থাকিত। কয়েক দিন হইল গাছটীতে ছোট বড় প্রায় সাত আটটী কুঁড়ি ধরিয়াছে।

বৈশাখ মাস; বেলা প্রায় ছয়টা বাজে বাজে; বাগানের খালি জমির উপর বাটীর ছায়া পড়িয়াছে; পরেশের পিতা সেইখানে একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া পুস্তক পড়িতেছেন; সুরেশ গাছে দিবার জন্য নীচে জল আনিতে গিয়াছে;—এমন সময় হঠাৎ একটা শব্দ হইল, ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলা ভাঙ্গা টবের কুচি পরেশের পিতার পায়ের নিকট ছিট্‌কাইয়া পড়িল। পরেশের পিতা একটু চমকাইয়া উঠিয়া যে দিকে শব্দ হইল সেইদিকে চাহিবামাত্র দেখিলেন,—সুরেশের সাধের টবটী জানালা হইতে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

সুরেশের মা পার্শ্বের ঘরে জিনিস পত্র গুছাইতেছিলেন, তিনি সিঁড়ি হইতে, "হায়! হায়! কে সুরেশের টব ভাঙ্গিল? দেখত ঝি!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঝিকে ডাকিতে লাগিলেন। সুরেশ ছল ছল চক্ষে ভাঙ্গা টবের দিকে চাহিয়া পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

ঝি তাড়াতাড়ি উপরে গেল। পরেশের মা বলিলেন, "আমাদের বাগানের সমস্ত গাছ নষ্ট হইলেও আমার এত দুঃখ হইত না। আহা এমন সুন্দর টব! এমন সুন্দর ফুল ধরিতেছিল! সুরু আমার গাছটীকে কত যত্ন করিত! আহা! বাছা আমার গত শ্রাবণ মাসে জন্মদিন উপলক্ষে গাছটী পাইয়াছিল। এ নিশ্চয় দুরন্ত পরেশেরকর্ম্ম।"

এই সময়ে পরেশের পিতা ও সুরেশও উপরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ঝি বলিল, "যদি মা পরেশ টব ফেলিয়া থাকে, তবে দৈবাৎ ফেলিয়াছে। ওর দাঁড়াইবার দোষে টব পড়িয়া গিয়াছে; পরেশ ইচ্ছা করিয়া টব ফেলে নাই। কি বল, পরেশ?" এই বলিয়া সে পরেশের কাণে কাণে বলিল, "বল না, তা না হ'লে তোমার বাবা বড় রাগ করিবেন।"

পরেশের মা বলিলেন, "আমার বোধ হয় তাহাই হইবে। দেখো বাবা, আর কখনও এমন কাজ করিও না। আমি বুঝিয়াছি তোমার দাদার ও আমাদের মনে কষ্ট দিয়া তুমি দুঃখিত হইয়াছ। এস আমার কোলে এস।"

পরেশ বলিল, "না মা, তুমি আমাকে কোলে করিও না। আমি বড় দুষ্ট; আমি ইচ্ছা করিয়া টব ফেলিয়া দিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া পরেশের পিতা পরেশের কাছে গিয়া বলিলেন,—"বটে! তা কেন এমন কাজ করিলে?"

পরেশ লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া বলিল, "বাবা, তুমি কেমন চমকিয়া উঠ, তাই দেখিবার জন্য টব ফেলিয়াছিলাম। আমি বড় অন্যায় করিয়াছি। তুমি আমাকে মার; খুব মার।"

পরেশের পিতা পরেশকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "বাপু! তুমি অন্যায় কাজ করি-

য়াছ। কিন্তু তুমি শাস্তি পাইবার ভয় সত্ত্বেও সত্য কথা কহিয়াছ বলিয়া আমি জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম,—ইহা যদি চিরজীবন তোমার স্মরণ থাকে তাহা হইলে এ সমস্ত দোষ কাটিয়া যাইবে। দেখ ঝি! তুমি যদি পুনরায় কখনও ইহাকে এই রকমে মিথ্যা কথা কহিতে শিখাও, তাহা হইলে তোমাকে অন্যত্র চাকরির চেষ্টা দেখিতে হইবে।" এইরূপে সেদিনকার ব্যাপার চুকিয়া গেল।

পরেশের পিতার স্বভাব ছিল যে, তিনি সোজা সুজি 'এই কর,' ঝি 'অমুক কাজ করিও না' বলিয়া উপদেশ দিতেন না। কোন্ অবস্থায় কিরূপ কাজ করিতে হইবে তিনি কেবল তাহার আভাস দিয়া চুপ করিয়া থাকিতেন। তাহার পর তুমি নিজে বুদ্ধি খাটাইয়া কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লও। উপরের বর্ণিত ঘটনার কিছুদিন পরে পরেশের পিতার একবন্ধু পরেশকে হাতীর দাঁতের গুটিকতক সুন্দর খেলানাশুদ্ধ একটী বাক্স দিয়াছিলেন। তাহা পাইয়া পরেশের অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছিল। সে রাত্রি দিন ঐ সকল খেলানা লইয়া খেলা করিয়াও তৃপ্ত হইত না; এবং শয়নকালে খেলানা বাক্সটী মাথার বালিসের কাছে রাখিয়া ঘুমাইত।

একদিন পরেশের পিতা বলিলেন, "তুমি অন্য সকল খেলানার চেয়ে এইগুলিকে অধিক ভাল বাস, না?"

পরেশ বলিল, "হাঁ, বাবা।"

"আচ্ছা, সুরেশ যদি তোমার এই খেলানা বাক্সটী জানালা হইতে ফেলিয়া দিয়া সব ভাঙ্গিয়া দেয়, তাহা হইলে তোমার মনে কষ্ট হয় না কি?"

পরেশ অত্যন্ত কাতরভাবে পিতার দিকে চাহিয়া রহিল, কোন উত্তর করিল না।

পরেশের পিতা বলিতে লাগিলেন, "ভাল, তুমি গল্পে যে সকল বাজিকরের কথা শুনিয়াছ তাহাদের একজন যদি মন্ত্রের জোরে তোমার এই খেলানার বাক্সটীকে একটী গোলাপ গাছ শুদ্ধ সুন্দর চীনামাটির টব করিয়া দেয় এবং তোমাকে ঐ টবটী লইয়া তোমার দাদার ঘরের জানালায় রাখিতে দেয়, তাহা হইলে বোধ হয় তোমার খুব আনন্দ হয়?"

পরেশ কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "হাঁ বাবা, তাহা হইলে নিশ্চয় আমার অত্যন্ত আহ্লাদ হয়।"

পরেশের পিতা বলিলেন, "আমি বিশ্বাস করি যে তুমি এ কথা মনের সহিত বলিতেছ। কিন্তু কেবল সাধু ইচ্ছায় অসৎ কার্য্যের দোষ খণ্ডন হয় না। সৎকার্য্য করা চাই।"

এই বলিয়া তিনি দ্বার বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার অভিপ্রায় কি, পরেশ ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। কিন্তু সেদিন কেহ পরেশকে ঐ বাক্স লইয়া আর খেলা করিতে দেখে নাই। পরদিন প্রাতঃকালে পরেশের পিতা দেখিলেন পরেশ একটী বাগানে একটী গাছতলায় বসিয়া আছে। তিনি সেই দিক্ দিয়া যাইতে যাইতে পরেশকে দেখিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাহার মুখের দিকে গম্ভীর ভাবে একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"বাবা পরেশ, আমি বাহিরে বেড়াইতে যাইতেছি। তুমি আমার সঙ্গে আসিবে? ভাল কথা, তোমার খেলানার বাক্সটী অমনি হাতে করিয়া আনিও। আমি সেটী একজনকে দেখাইতে ইচ্ছা করি।" দৌড়াইয়া ঘরে গিয়া বাক্সটী লইয়া আসিল এবং পিতার সঙ্গে বেড়াইতে যাইবে এই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার সহিত বাটী হইতে বহির্গত হইল।

প্রমদাচরণ সেন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

চতুর্থ ভাগ।

১৮৮৬।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী, এম, এ, কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

"THE CHILD IS FATHER OF THE MAN."

কলিকাতা

২ নং বেনেটোলা লেন, "সখা" কার্য্যালয় হইতে
প্রকাশিত।

কলিকাতা ২ নং বেনেটোলা লেন, "সখা"-যন্ত্রে,
শ্রীললিতমোহন দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সূচী-পত্র।

বিষয়		লেখক বা লেখিকার নাম		পত্রাঙ্ক।
৺অক্ষয়কুমার দত্ত।	...	সীতানাথ নন্দী বি, এ,	...	৯৪
অতলস্পর্শ	...	ভুবনমোহন রায়	...	১৩৯
অবাধ্যতার প্রতিফল	...	কুমারী স্নেহলতা দেবী	...	৫৬
আখ্যানমালা	...	অন্নদাচরণ সেন	...	২১
আবদারে ছেলে (সচিত্র পদ্য)	...	সম্পাদক	...	১০
আশ্চর্য্য কর্ত্তব্যপরায়ণতা	...	ললিতমোহন দাস	...	৪৭
উকিলের পরামর্শ	...	আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় বি, এ,	...	৫৪
উভয় সঙ্কট (সচিত্র পদ্য)	...	বিহারীলাল গুহ	...	১৮৬
কর্ত্তব্য পরায়ণ পুত্র	...	কুমারী লাবণ্যপ্রভা বসু	...	১৬১
কলের জাহাজ (সচিত্র)	...	আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় বি, এ,	...	৮১, ১০০
কুকুরের চাতুরী	...	সম্পাদক	...	১৫
কেমন ছবি এঁকেছি (সচিত্র)	...	ভুবনমোহন রায়	...	২৯
গরিলা (সচিত্র)	...	উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, বি, এ,	...	৭৪, ৮৩
গ্লটন্ (সচিত্র)	...	উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী বি, এ,	...	১৮৮
গুরুদরবার (সচিত্র)	...	সম্পাদক	...	৪৪
চতুর্থ বর্ষ	...	ঐ	...	১
চন্দ্রমুখীর সাজা	...	ঐ	...	২৫
চীনের গল্প (সচিত্র)	...	উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি, এ,	...	১০
চোর বিড়াল (পদ্য)	...	শ্রীমতী মাঃ	...	২৮
জানোয়ারের বুদ্ধি	...	সম্পাদক	...	১৭৬, ১৭৭
জোয়ার ভাঁটা (সচিত্র)	...	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ,	...	৩৮, ৫৯
জোসেফ ম্যাট্‌সিনি (সচিত্র)	...	সম্পাদক	...	৩৩, ৪৯
ঢাকাই মস্‌লিন (সচিত্র)	...	দেবেন্দ্রনাথ ধর	...	১২৪, ১৩৪, ১৪৮
দীপশিখা	...	উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী বি, এ,	...	১৮২
দুটী বোন (সচিত্র)	...	নিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	৫১
ধাঁধা	...			১৬, ৩২, ৪৮, ৮০, ৯৫, ১১২ ১৪৪, ১৭৬
ধ্রুবোপাখ্যান	...	শ্রীমতী কিরণশশী চট্টোপাধ্যায়	...	১৫২
নাক ও চোকের বিবাদ (পদ্য)	...	বিপিনবিহারী সেন	...	১৪
নানা প্রসঙ্গ (সচিত্র)	...	উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি, এ,		৭১, ৮৬, ১০৩, ১৭১

সূচীপত্র।

নারীর বীরত্ব	...	ললিতমোহন দাস	৬৯
পরেশ ও তাহার পিতা	...	আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় বি, এ,	১৭৮
পরলোকগত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	...	সম্পাদক	১৪৫
পূর্ণিমা ও অমাবস্যা (সচিত্র)	...	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ,	১৭
প্রকাশের পরিবর্ত্তন	...	শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী	১৮৪
প্রকৃত ঘটনা	...	জনৈক বঙ্গ মহিলা	১১৮
প্রবাল কীট (সচিত্র)	...	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ,	৬৫
প্রবাল দ্বীপ (সচিত্র)	...	ঐ	৯৭
পৃথিবীর গোলত্ব (সচিত্র)	...	ঐ	১১৩
ফুলের সাজি	...	ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়	৭৮, ৯১ ১১০, ১২০, ১৫০, ১৭৩
বনলতা	...	ভুবনমোহন রায়	১৯০
বর্ষশেষ	...	ঐ	১৯২
বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর	...	সম্পাদক	৬
বেলুন (সচিত্র)	...	উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি, এ,	২৩, ৪১, ৭৩
ভাই বোন্ (পদ্য)	...	শ্রীমতী মাঃ	১৩৩
ভিখারিণী মেয়ে (পদ্য)		ঐ	৮৫
ভোঁদড় (সচিত্র)	...	উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী বি, এ,	৬২
ভোলানাথের ধাঁধা (সচিত্র পদ্য)	...	চিরঞ্জীব শর্ম্মা	১১৯
মন পরীক্ষা	...	অন্নদাচরণ সেন	৩২
মশা (সচিত্র)	...	উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি, এ,	১৫৯
মহাত্মা নেল্‌সনের গল্প	...	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ,	১৬৩
মাতার প্রশ্ন	...	বিপিনবিহারী সেন	৭৭
মুদ্রাযন্ত্র (সচিত্র)	...	উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি, এ,	১৬৬
রামকান্তের ঘোড়া (সচিত্র)	...	সম্পাদক	৬৮
রেড়ির গাছ (সচিত্র)	...	দেবেন্দ্রনাথ ধর	২
লণ্ডন মেলা (সচিত্র)	...	ঐ	১০৭
শাক্যমুনির ক্ষমা	...	চিরঞ্জীব শর্ম্মা	৩১
শিশুর আমোদ (সচিত্র পদ্য)	...	নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১০৫
শ্যামচাঁদের পাচদশা (সচিত্র)	...	সম্পাদক	১৪২
সতীশ সকলের অপ্রিয় কেন ?	...	শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী	১৫৫
সার উইলিয়ম জোন্স (সচিত্র)	...	সম্পাদক	৮৮
সাধের খেলা (সচিত্র পদ্য)	...	ভুবনমোহন রায়	১৩৮
স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ	...	সম্পাদক	১২৯
স্নেহলতার দয়া	...	ভুবনমোহন রায়	১৬৮

পথে যাইতে যাইতে পরেশ বলিল, "বাবা, এখনও আর সে রকম বাজিকর নাই?"

"কেন, তাহাতে কি?"

"তবে কেমন করিয়া আমার খেলার বাক্সটী গোলাপ গাছের টব হইবে?"

পরেশের পিতা বলিলেন, "বাবা যাহাদের ভাল কাজ করিবার আন্তরিক ইচ্ছা আছে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে দুইজন বাজিকর থাকে। একজন এইখানে" এই বলিয়া পরেশের পিতা পরেশের বক্ষস্থলে হাত দিলেন এবং তাহার পর তাহার কপালে হাত দিয়া বলিলেন, "আর একজন এইখানে থাকে।"

"বাবা, আমি তোমার কথা বুঝিতে পারিলাম না।"

"বুঝিতে চেষ্টা কর। বিলম্ব হইলে ক্ষতি নাই।"

এইরূপে কথা কহিতে কহিতে তাঁহারা এক ফুলগাছ বিক্রেতার গৃহে উপস্থিত হইলেন, এবং নানা প্রকারের গাছ দেখিতে দেখিতে একটী সুন্দর গোলাপ ফুলের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। পরেশের পিতা গাছটী দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "আহা! সুরেশ যে গাছটী ভাল বাসিত, এটী যে দেখিতেছি তাহার চেয়ে ভাল। এ গাছটীর দাম কত গা?" মালী বলিল, "আজ্ঞা, চারিটাকা।" পরেশের পিতা পকেট হইতে হাত তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "তবে আজি আর হইল না। আজি সঙ্গে অধিক টাকা নাই।"

তাহার পর পিতাপুত্রে সহরের মধ্যে একজন চীনাবাসনওয়ালার দোকানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে আসিয়া পরেশের পিতা দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি গত শ্রাবণ মাসে যেমন একটী ফুলের টব লইয়াছিলাম, সেরকম টব আর আছে?" এবং সম্মুখে সেইরূপ একটী টব দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "ইহার দাম কত?" দোকানদার বলিল, "দুই টাকা।" তাহার পর পরেশের পিতা দোকান হইতে বাহিরে আসিয়া পরেশকে বলিলেন, "তোমার দাদার আগামী জন্মদিনে তাহাকে আর একটী গোলাপফুলের টব কিনিয়া দেওয়া যাইবে। যদি তাহার এখনও কয়েকমাস বিলম্ব আছে, তাহাতে ক্ষতি নাই। গোলাপ ফুল ত দুই দিনে শুকাইয়া যায়, কিন্তু সত্যের সৌন্দর্য্য কখনও মলিন হয় না; আর যে প্রতিজ্ঞার কখনও ভঙ্গ হয় না, চীনাবাসনের অপেক্ষা তাহা অধিক মূল্যবান্।"

পরেশ এতক্ষণ মাথাহেঁট করিয়াছিল। পিতার শেষ কথা শুনিয়া সে মাথা তুলিয়া কথা কহিবার উপক্রম করিল; কিন্তু আনন্দে তাহার কথা সরিল না।

তাহার পর পরেশের পিতা একজন খেলানা বিক্রেতার দোকানে প্রবেশ করিয়া দোকানদারকে বলিলেন, "আমার কাছে তোমার যে টাকা পাওনা আছে অদ্য তাহা দিতে আসিয়াছি। আর এক কথা মনে পড়িল, গত বৎসর তোমার দোকান হইতে আমি যে একটী হাতীর দাঁতের বাক্স কিনিয়া ছিলাম তাহার অপেক্ষা আমার ছেলের এই খেলানার বাক্সটীর কাজ কত পরিষ্কার দেখ দেখি। পরেশ! বাক্সটী দেখাও ত, সকল জিনিসের দাম জানিয়া রাখা ভাল? কেননা এক সময় হয় ত তাহা বিক্রয় করিবার ইচ্ছা হইতে পারে। যদি আমার ছেলে মনে করে যে এই খেলানার বাক্সে তাহার আর দরকার নাই, তাহা হইলে কতদাম দিয়া তোমরা এটী কিনিতে পার?"

দোকানদার বলিল, "নয় টাকার অধিক দিতে পারি না আর যদি আপনার ছেলে দোকা-

নের এই সব সুন্দর খেলানার মধ্য হইতে কোন জিনিস পছন্দ করিয়া লন তবে সে ভিন্ন কথা।”

পরেশের পিতা বলিলেন, “তবে তোমরা নয় টাকায় এটী কিনিতে পার? আচ্ছা দেখ পরেশ, যদি কখনও তোমার এই খেলানার বাক্সে প্রয়োজন নাই বলিয়া মনে হয়, তবে তুমি ইহা তখনই বিক্রয় করিতে পার। আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই।”

পরেশের পিতা দোকানদারকে তাহার প্রাপ্য টাকা দিয়া চলিয়া আসিলে পরেশ কিন্তু একটু বিলম্বে দোকান হইতে বাহির হইয়া আসিল। এবং দৌড়িয়া পিতার নিকট আসিয়া আনন্দে হাততালি দিতে দিতে বলিল, “বাবা, এই দেখ এখন আমরা সেই গোলাপ গাছ ও সেই চীনামাটির টব কিনিতে পারিব।” এই বলিয়া পরেশ পকেট হইতে কতকগুলি টাকা বাহির করিল।

পরেশের পিতা রুমাল দিয়া চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন, “আমি কি ঠিক্ কথা বলি নাই? তুমি সেই দুইজন বাজিকরের দেখা পাইয়াছ!”

* * * *

সেদিন বাড়ী ফিরিবার পর গোলাপ গাছশুদ্ধ টবটি সুরেশের ঘরের জানালায় রাখিয়া পরেশ যখন মাকে ও সুরেশকে উহা দেখাইবার জন্য ডাকিতে গেল, তখন তাহার আনন্দের সীমা দেখে কে?

পরেশের পিতা বলিলেন, “পরেশের কর্ম্ম; উহার টাকাতেই ফুলের টব আসিয়াছে। পরেশ সৎকর্ম্ম দ্বারা অসৎকর্ম্মের দোষ খণ্ডন করিয়াছে।”

সমস্ত ঘটনা শুনিয়া পরেশের মা বলিলেন, “সে কি কথা? আহা! বাছা আমার যে সেই খেলানার বাক্সটী বড় ভালবাসিত। তুমি আজি বৈকালেই যত দাম লাগে দিয়া বাক্সটী কিনিয়া আনিও। আমি টাকা দিব।”

সুরেশ কহিল, “বাবা, মার কাছে আমার বার টাকা আছে। আমার সে টাকাতে কোন দরকার নাই। তুমি সেই টাকা দিয়া পরেশের বাক্স আনিয়া দিও।”

পিতা বলিলেন, “কি বল পরেশ? বাক্সটী কি ফিরাইয়া আনিব?”

“না বাবা, না। তা হ'লে আমার আহ্লাদ করিবার আর কি রহিল?” এই বলিয়া পরেশ পিতার বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

তখন পরেশের পিতা তাঁহার স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—“দেখ আমি সন্তানদিগকে যে সকল শিক্ষা দিতে চাই তাহার মধ্যে স্বার্থত্যাগের সুখ ও পবিত্রতা সর্ব্বপ্রধান। চিরজীবন উহাদিগের এই শিক্ষা পাওয়া উচিত বলিয়া আমার বিশ্বাস। অতএব যাহাতে এই সুশিক্ষা নিষ্ফল হইয়া যায় তাহা করিবার প্রয়োজন নাই।”

দীপশিখা।

এ বারে আমরা দীপশিখা সম্বন্ধে কিছু বলিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম; এখন সেই প্রতিজ্ঞা পালন করা যাইতেছে।

আমাদের কথাগুলি পরিষ্কার বুঝিতে হইলে একটী প্রদীপ জ্বালিয়া সামনে রাখ। প্রদীপের তেল পলিতার ভিতরদিয়া আস্তে আস্তে ঊর্দ্ধগামী হইতেছে। পলিতার মুখে তুমি আগুন লাগাইয়া দিয়াছ সুতরাং এই ঊর্দ্ধগামী তৈল ঐ আগুনের কাছে আসিয়াই গরমে বাষ্প হইয়া যাইতেছে। এই বাষ্প আগুন পাইলেই জ্বলিয়া উঠে। সেই জ্বলন্ত বাষ্পকেই আমরা প্রদীপের শিখা বলি।

এখন দেখা যাউক এই বাষ্প জ্বলিবার সময় ব্যাপারটা কিরূপ হয়। বাতাসে অম্লজান বায়ু আছে; আর তেলের বাষ্প অম্লজানের সহিত মিশিয়া জলীয় বাষ্প ও কার্ব্বণিক য়্যাসিড্ বায়ুর সৃষ্টি করে। তেলের বাষ্পে যে জলজান বায়ু আছে তাহা অম্লজানের সহিত মিশিয়া জল হয়, আর উহাতে যে অঙ্গারের ভাগ আছে তাহা অম্লজানের সহিত মিশিয়া কার্ব্বণিক য়্যাসিডের উৎপত্তি হয়।

প্রদীপের শিখার প্রতি বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিলে দেখিবে যে, তাহার গোড়ার দিকের কতকটা অংশ অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বল। এই স্থানের ভিতরে একটী দেশলায়ের কাঠি ঢুকাইয়া দাও। কাঠিটী যাই একটু পুড়িতে আরম্ভ হইল, অমনি তাহাকে লইয়া আইস। এখন দেখিবে যে কাঠির যে স্থান দীপের ঠিক মধ্যস্থলে ছিল, সে স্থান জ্বলে নাই। তাহাতে এই বুঝা যায় যে দীপের ভিতরটা ফাপা, অর্থাৎ সেখানে আগুন নাই। বিশেষ অনুধাবন করিলে দেখিতে পাইবে যে, দীপের অত্যুজ্জ্বল অংশের চারিধারে অতি ক্ষীণ আলোক বিশিষ্ট একটী আবরণ আছে। তবে দেখিতেছি দীপের তিনটী অঙ্গ হইল। এইরূপ তিন অঙ্গ কেন হইল বলি, শুন।

পলিতার অগ্রভাগ হইতে ক্রমশঃ তৈল বাষ্প হইয়া উঠিতেছে। প্রথমে বাষ্পের জলজানের ভাগটুকু বাতাসের অম্লজানের সহিত মিশে। তখন জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হইয়া উড়িয়া যায়, আর অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অঙ্গারের কণাগুলি পৃথক হইয়া পড়ে। এইরূপ মিশিবার সময় সেই স্থানটা এত গরম হয় যে, ঐ অঙ্গারের কণাগুলি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে থাকে। এইরূপে দীপের শিখার সৃষ্টি হয়। দীপের শিখার ভিতরে যে ফাঁপা জায়গাটুকু দেখিয়াছ, তাহা কি জান? পলিতার মুখ দিয়া ক্রমাগত তেলের বাষ্প উঠিয়া ঐ স্থানে একত্র হইয়াছে। বাতাসের অম্লজান ক্রমে ক্রমে ঐ বাষ্পের সহিত মিশিবে, কিন্তু এদিকে আবার নূতন বাষ্প আসিয়া জমিবে; সুতরাং ঐ স্থানটুকু ঐ রূপ ফাপাই থাকিবে। ঐ উজ্জ্বল অংশের চারিধারেও যে আবার একটী আবরণ আছে দেখিলে, সেখানে কি হইতেছে জান? যে অঙ্গারের কণা তাতিয়া ঐ উজ্জ্বল অংশের সৃষ্টি করিয়াছে, সেই অঙ্গার এইস্থানে আসিয়া বাতাসের অম্লজানের সহিত মিশিয়া কার্ব্বনিক য়্যাসিড্ হইতেছে। আমরা যে প্রদীপের শিখাকে উজ্জ্বল দেখি তাহার কারণ ঐ অঙ্গার-কণাগুলি। সে গুলি কঠিন জিনিস। কেবল মাত্র কঠিন জিনিসই তাতিয়া উজ্জ্বল হইতে পারে। অঙ্গার-কণা গুলি যখন অম্লজানের সহিত মিশিয়া কার্ব্বনিক য়্যাসিড হইল, তখন আর তাহারা কঠিন রহিল না; কার্ব্বনিক য়্যাসিড একটা বায়ু, তাহা কঠিন জিনিস নহে। এই জন্যই বাহিরের ঐ স্থানটুকু উজ্জ্বল নহে।

আমরা দেখিলাম যে তেলের বাষ্প অম্লজানের সহিত মিশিতে যাইয়াই দীপশিখার সৃষ্টি করে। কিন্তু এইরূপ মিশিতে হইলে যথেষ্ট উত্তাপের

প্রয়োজন। ফু দিলে প্রদীপ নিভিয়া যায় কেন জান? ফু দিয়া প্রদীপ জ্বালিবার পক্ষে আমরা ব্যাঘাত জন্মাই; কারণ তৈলের বাষ্প অম্লজানের সহিত মিশিবার সময় যে উত্তাপের সৃষ্টি হইয়াছিল, ফু দিয়া সেই উত্তাপটাকে আমরা তাড়াইয়া দিই। তখন আর পলিতার মুখ হইতে বাষ্প উঠিয়াও উত্তাপের অভাবে অম্লজানের সহিত মিশিতে পারে না; সুতরাং তখন দীপশিখারও সৃষ্টি হয় না। শিখার যে উত্তাপটুকু ছিল, তাহারই তেজে তৈল এতক্ষণ বাষ্প হইয়া আসিতেছিল। এখন শিখা নাই, কাজেই এখন আর তেলও বাষ্প হইতে পারিতেছে না। তবে আর দীপ জ্বলিবে কি করিয়া?

ক্রমশঃ

প্রকাশের পরিবর্ত্তন।

প্রকাশের একটী রোগ ছিল, তিনি বুঝুন আর না বুঝুন সকল কথাতেই উত্তর করিতেন, ছেলে মানুষ হইয়া বুড়োদের মুখে মুখে তর্ক করিতেন। প্রকাশ যখন ক্লাশে পড়িতে বসিতেন তখন শিক্ষক মহাশয়ের সকল প্রশ্নের উত্তরেই তিনি মাথা নাড়িয়া মাতুব্বরী করিতে যাইতেন, অন্যকে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইত তাহাতেও তিনি উপযাচক হইয়া হাত দিতেন। বাড়ীতে যখন কোন ভদ্রলোক তাঁহার পিতার সহিত কথপোকথন করিতেছেন তিনি, সেইস্থানে উপস্থিত হইতেন এবং বৃদ্ধদের কথার ভিতর কথা কহিয়া পিতার বিরাগভাজন হইতেন। প্রকাশের শুধু এই একটী রোগ থাকিলে আর ভাবনার বিষয় ছিল না, অনেক রোগে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল।

লোকে ভাল বলুক, লোকে ভাল বাসুক এই ইচ্ছা প্রকাশের মনে বড় প্রবল ছিল। ভাল কাজ না করিলে যে লোকে সুখ্যাতি করে না, মধুর স্বভাব না হইলে যে লোকে ভালবাসিতে পারে না, এ বিবেচনা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। অথচ যখনই তাঁহার দোষ দেখাইয়া তাঁহার পিতা মাতা কি আত্মীয় স্বজনেরা তিরস্কার করিতেন তখনই তিনি অভিমানে মুখ ফুলাইয়া কাঁদিতেন, কখন বা মাতাকে দুঃখ করিয়া বলিতেন, "লোকে কেবল আমার দোষই দেখে!"

প্রকাশ বোকার মত অনেক কথা কহিতেন, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস ছিল তিনি বুদ্ধিমান ছেলের ন্যায় কথা কহিতে পারেন। এই ভুল বিশ্বাসে তাঁহার বড় অনিষ্ট হইয়াছিল, তিনি বৃথা অভিমানী হইয়া লোকের কথা গ্রাহ্য করিতেন না, কেহ কিছু ভাল বলিলেও তাহা গ্রহণ করিতে পারিতেন না এবং কাহারও নিকটে কিছু শিখিতে যাইতে নিজকে অপমানিত মনে করিতেন।

প্রকাশের এই সকল দোষ দূর করিবার জন্য তাঁহার পিতা, মাতা, শিক্ষক মহাশয় প্রভৃতি অনেকেই নানা উপায়ে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রকাশের মনে বড়ই ঘৃণার উদয় হইল। তিনি মনে মনে তাঁহার দোষের আলোচনা

এখন ঐ অনাথা স্ত্রী ভিক্ষা করিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিতেছে। কিন্তু ভিক্ষা সকল সময় মিলে না! কাল যাহা ভিক্ষা করিয়া পাইয়াছিল, তাহাতে অতি কষ্টে কাল এক বেলা চলিয়াছিল, কিন্তু রাত্রিতে তাহাদিগকে উপবাস করিতে হইয়াছে। নানা কষ্টে স্ত্রীলোকটীরও কঠিন ব্যারাম হইয়াছে, রোগ যাতনায় সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই, ছট্ ফট্ করিয়া কাটাইয়াছে, প্রাতঃকালে তাহার একটু ঘুম আসিয়াছে, এমন সময় তাহার ছেলে দুটি জাগিয়া উঠিল। আগের দিন রাত্রিতে কিছু খায় নাই বলিয়া তাহারা যার পর নাই ক্ষুধিত হইয়াছিল। এখন উঠিয়া মাকে জাগাইয়া তুলিয়া খাবার চাহিতে লাগিল। অবোধ ছেলেরা জানিত না যে, ঘরে কিছুই খাবার নাই! তাহারা কেবল মাকেই জানে, তাহারা জানে মা থাকিলে আর খাবার ভাবনা নাই, তাই মাকে জাগাইয়া বলিতে লাগিল "মা বড় ক্ষিধে পেয়েছে, খেতে দে।" অনাথা স্ত্রীলোকের হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যখন এই কথা কাণে গেল—"মা বড় ক্ষিধে পেয়েছে, খেতে দে" তখন তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। ছেলেদের মুখের দিকে তাকাইয়া তাহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ছেলেরা তাহা বুঝিল না, আরও আব্দার করিতে লাগিল,—"মা বড় ক্ষিধে পেয়েছে, খেতে দে।" তখন সেই অনাথা বিধবা আর অন্য উপায় না দেখিয়া ছেলেদুটীকে সঙ্গে লইয়া ভিক্ষার জন্য বাহির হইল। রোগ যন্ত্রণায় তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, খানিক চলিয়া এক একবার বসিয়া পড়িতেছে, আবার খানিক চলিতেছে। এই ভাবে দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছে, কিন্তু এই দুই প্রহর বেলা হইয়াছে, এখন পর্য্যন্ত কেহ দয়া করিয়া তাহাকে একমুষ্টি ভিক্ষা দেয় নাই, যাহা দ্বারা ছেলেদুটীকে একটু শান্ত করিতে পারে। রোগে, অনাহারে, পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া আর চলিতে না পারিয়া সেই অনাথা একটা বাড়ীর সম্মুখে বসিয়া পড়িল; এবং আর কোন উপায় না দেখিয়া হাতের উপর মাথাটী রাখিয়া কেবল কাঁদিতে লাগিল। ছেলেরাও ক্ষুধার জ্বালায় ছট্ ফট্ করিতেছে! তাহারা কাঁদিতেছে আর বলিতেছে "মা খেতে দে" "মা খেতে দে।" যে বাড়ীর সম্মুখে সেই অনাথা স্ত্রীলোক বসিয়া পড়িয়াছিল, সে বাড়ীটী বেশ বড়। খানিক বসিয়া অনাথা স্ত্রীলোকটী ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করিল। বাড়ীর কর্ত্তা আহারের পর গিয়া শুইয়াছেন, ভৃত্যেরা তাঁহাকে বাতাস করিতেছে; সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, বাবু এখন ঘুমাইবেন। বাবুর ছেলেও আহারের পর নীচের বসিবার ঘরে একটা সোফার উপর শুইয়া বিশ্রাম করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় সেই অনাথা স্ত্রীলোক কাতর স্বরে বলিল "মাগো দুটী ভিক্ষা পাই।" সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা চিৎকার করিয়া উঠিল "মা বড় ক্ষিধে পেয়েছে, খেতে দে"। বাবুরা আহার করিয়াছেন, এখন একটু নিদ্রা যাইবেন, এমন সময় বাহিরে কে চিৎকার করিয়া ঘুমের ব্যাঘাত করিতেছে? বাবুর ছেলে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন একজন স্ত্রীলোক ভিক্ষা চাহিতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ হুকুম করিলেন, বাহির হইয়া যাও। ছেলে দুটি বড়ই কাঁদিতেছে, মায়ের প্রাণ সহ্য করিতে না পারিয়া অনাথা বিধবা আবার ভিক্ষা চাহিল; বাবুর আর সহ্য হইল না। তিনি চিৎকার করিয়া বলিলেন, বাহির হইয়া যাও। এই শব্দ বাড়ীর মধ্যে পৌছিল। বাবুর একটি মেয়ে ছিল, তাহার বয়স অধিক নহে, মেয়েটির নাম

স্নেহলতা। স্নেহলতা এই চিৎকার শুনিয়া দৌড়িয়া বাহিরে আসিল, আসিয়া দেখিল, তাহার দাদা রাগে কাঁপিতেছেন, আর দেখিল এক অনাথা বিধবা মলিন বিষণ্ণ মুখে বাহির হইয়া যাইতেছে, তাহার চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতেছে। সঙ্গে দুটী ছোট ছেলে, তখনও বলিতেছে "মা বড় ক্ষিধে পেয়েছে।"

"মা বড় ক্ষিধে পেয়েছে" এই কথা যেন স্নেহলতার বুকে বিঁধিল। আর সে যাহা দেখিল তাহাতে তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে তাহার নিজের ছোট ছোট দুখানি হাত দিয়া তাঁহার দাদার হাত দুখানি ধরিল, ধরিয়া সজল নয়নে বলিল "দাদা ইহারা বড় দুঃখী, ওদের উপর কেন রাগ কর, তোমার পায়ে পড়ি উহাদিগকে তাড়াইয়া দিও না। ভগিনীর এই কথা শুনিয়া ছেলে বাবুর রাগটা যেন একটু কমিল, তিনি ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। তখন স্নেহলতা ঐ অনাথা স্ত্রীলোকটীকে ডাকিয়া ফিরাইল, এবং তাহাদিগকে একটা জায়গায় বসাইয়া দৌড়িয়া উপরে গেল। স্নেহলতা প্রকৃতই স্নেহলতা! স্নেহলতার অন্তর স্নেহ, ভালবাসা, দয়াতে পূর্ণ। পরের দুঃখ দেখিলে তাহার বুক ফাটিয়া যাইত; চক্ষের জল রাখিতে পারিত না। বাড়ীতে সকলের খাওয়া দাওয়া হইয়া গিয়াছে, কিন্তু স্নেহলতা তখন পর্য্যন্তও খায় নাই। স্নেহলতাদের বাড়ীর পাশে একজনদের, তারই বয়সের, একটি মেয়ের মৃত্যু হইয়াছিল, তাই সে সেই বাড়ীতে গিয়া সেই মেয়ের মার কাছে বসিয়াছিল। তাই তার আজ এখনও খাওয়া হয় নাই। স্নেহলতা উপরে গিয়া তাহার খাবার সমস্ত জিনিস আনিয়া সেই অনাথার হাতে দিল। অনাথার চক্ষের জল উছলিয়া উঠিল; স্নেহলতার এত দয়া দেখিয়া তাহার চক্ষের জল আরও অধিক পড়িতে লাগিল। স্নেহলতা আবার উপরে গেল। উপরে তাহার বাবার ঘরে যাইয়া তাঁহার নিকট বলিল, "বাবা বাহিরে একজন বড় দুঃখী স্ত্রীলোক দুটি ছোট ছেলে লইয়া আসিয়াছে, তাহাদিগকে কিছু দিতে হইবে।" স্নেহলতা এমন ভাবে এই কথাগুলি বলিল যে তাহার পিতা তাহার দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। দেখিলেন তাহার চক্ষু ছল ছল করিতেছে। তাহার মুখখানি সেই অনাথা বিধবার দুঃখ দেখিয়া মলিন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহাতে যেন তাহার সুন্দর মুখখানি আরও সুন্দর দেখাইতেছে। ইহাই প্রকৃত সৌন্দর্য্য! তাঁহার ছেলে, যখন সেই অনাথাকে তাড়াইয়া দিবার জন্য চিৎকার করিতে ছিল তাহা তিনি শুনিয়াছিলেন, আর এখন স্নেহলতার দয়াও দেখিলেন; ছেলের নিষ্ঠুরতা ও মেয়ের দয়া দেখিয়া অনেক শিখিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ স্নেহলতার হাতে কয়েকটী টাকা দিয়া বলিলেন "মা এই লও, সেই অনাথাকে দিয়ে এস।" স্নেহলতা আহ্লাদে সেই টাকা লইয়া নীচে দৌড়িয়া গেল, এবং সেই অনাথার হাতে টাকা কয়েকটী দিল।

স্নেহলতা গৃহলক্ষ্মী। এই গৃহলক্ষ্মী যে গৃহে নাই, সে গৃহ ধন রত্নে পূর্ণ থাকিলেও শ্মশান। স্নেহলতার কাছে আজ তাহার পিতা ভ্রাতা যাহা শিখিলেন তাহা আর জন্মে ভুলিলেন না।

একবার ভাবিয়া দেখ দেখি কত অসহায়া অনাথা এই ভাবে দিনপাত করে! কেহবা সারাদিন পরে একমুঠা খাইতে পায়,—কেহবা তাহাও পায় না, অনাহারেই হয়ত দিনপাত করে। কতলোক দরিদ্রতার জন্য দুঃখকষ্ট ভোগ করে। আমরা হয়ত নানাপ্রকার ভাল ভাল খাবার

জিনিস দিয়া প্রত্যহ আহার করিতেছি, আর একজন হয়ত কেবল একমুঠা ভাতও পাইতেছে না। দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যে দুই প্রহরের সময় বা দারুণ শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে, মুষ্টি ভিক্ষার জন্য কতজন দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছে, আমরা তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিতেছি না। আমরা নিজের সুখ স্বচ্ছন্দ লইয়াই ব্যস্ত, আমার প্রতিবাসী যে অনাহারে মরিতেছে, কত দুঃখী-লোক যে একমুঠা ভাতের জন্য হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছে, তাহা আমরা দেখিতেছি না।

সখার পাঠক পাঠিকা! দুঃখীকে কেমন করিয়া দয়া করিতে হয় তোমরা কি স্নেহলতার কাছে আজ তাহা শিখিবে? পাঠিকাগণ! তোমরা কি স্নেহলতার ন্যায় স্নেহময়ী হইবে?

নানা প্রসঙ্গ।

মাকে যদি কেহ লাঠি লইয়া মারিতে আইসে, তবে তুমি কি কর?—দৌড়াইয়া পলাও। আততায়ীর হাত এড়াইবার ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া আমরা মনে করি। কিন্তু অনেক জানোয়ার ইহা অপেক্ষা অন্যরূপ উপায় অবলম্বন করে।

অনেক জানোয়ার এইরূপ অবস্থায় পড়িলে মড়ার মত হইয়া পড়িয়া থাকে। এইরূপে অনেক সময় বিপদ হইতে রক্ষা পায়।

পীউইট্ পাখীর বাসার কাছে মানুষ গেলে পীউইট্ ভান করে যেন সে ভাল করিয়া উড়িতে পারে না। এরূপ পাখীকে ধরা সহজ মনে করিয়া অনেকেই তাহার পেছনে পেছনে যায়। এইরূপে পাখী তাহাকে ভুলাইয়া বাসা হইতে দূরে লইয়া যায়।

কেন্দ্রাইকে বিরক্ত করিলে সে শরীর গুটাইয়া গোলাকার হইয়া থাকে। ইহা হইতেই কেন্দ্রাই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত হেঁয়ালিটী উৎপন্ন হইয়াছে:—

"ছ'কুড়ি ছ'খানা পা,
রক্ত বরণ গা,
টোকা দিলে টাকাটী হয়
তাকে তুই খা।"

উট পক্ষীকে কুকুরেরা তাড়া করিলে যখন সে মনে করে যে আর ইহাদের হাত এড়ান গেল না তখন মাথাটী বালির নীচে গুঁজিয়া রাখে। অবশ্য ইহাতে বিপরীত ফলই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু উটপক্ষী প্রথমে মনে করে যে বড়ই নিরাপদ হইয়াছে।

এক প্রকারের পোকা আছে তাহারা নিজের বাড়ী ঘর সঙ্গে লইয়া বেড়ায়। কোনরূপ ভয় পাইলেই ঘরের ভিতর লুকাইয়া থাকে।

এক প্রকারের ফড়িং আছে, তাহার পাখা দুটী একত্র করিলে দেখিতে ঠিক গাছের পাতার মতন হয়। তখন আর তাহাদিগকে সহজে চিনিতে পারা যায় না। এইরূপে তাহারা ফড়িং-খাদক পাখীদের হাত হইতে রক্ষা পায়।

গুগ্‌লিরা যখন নিতান্তই বেকায়দা দেখে তখন তাহারা মুখের কাছের দরজাটী বন্ধ করিয়া দেয়।

শম্বুকজাতীয় অনেক প্রকার জলজীব আছে, তাহারা যখন দেখে যে শত্রুর হাত হইতে বাঁচিবার আর অন্য উপায় নাই, তখন এক প্রকার কাল জিনিস পেটের ভিতর হইতে বাহির করিয়া দেয়। ইহাতে জলটা অনেক দূর পর্য্যন্ত এত কাল হইয়া যায় যে, আর তাহার ভিতর দিয়া কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। এই অবসরে সে পলাইয়া কোন নিরাপদ স্থানে যায়।

কচ্ছপগুলির কাণ্ড কারখানা সকলেই দেখিয়াছ, সুতরাং তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলার আবশ্যক দেখি না। এক প্রকারের কচ্ছপ আবার শুধু গলাটী আর হাতপাগুলি ভিতরে লইয়া গিয়াই সন্তুষ্ট হয় না। তাহার শরীরের আবরণটা কবাটের মত হইয়া সেই হাত পাগুলিকে ঢাকিয়া রাখে।

শেয়ালগুলি যে কতবার মরিয়া থাকে তাহা আর কি বলিব। এ বিষয়ে শেয়ালের সঙ্গে আর কেহ পারিবে না।

বুনোরোহিতের আঁইস বলিয়া এক প্রকার আঁইস অনেক জায়গায় বিক্রয় হয়; অনেকে তাহাতে আংটী প্রস্তুত করিয়া হাতে দেয়। বাস্তবিকই যে জঙ্গলে কোনরূপ রোহিত মাছ থাকে বা ঐগুলি যে মাছেরই আঁইস, তোমরা এরূপ মনে করিও না। ঐ সকল আঁইস এক প্রকার চতুষ্পদ জানোয়ারের। আমাদের দেশে এইরূপ জানোয়ার অতি অল্পই আছে; সুতরাং আমরা উহাদিগকে সচরাচর দেখিতে পাই না, দক্ষিণ আমেরিকায় এই জাতীয় অনেক জন্তু বাস করে। এই সকল জন্তুকে আর্মেডিলো বলা হয়। আর্মেডিলো অনেক প্রকারের হইয়া থাকে; অপর পার্শ্বে একটীর ছবি দেওয়া গেল।

দক্ষিণ আমেরিকায় অনেক বাঁদর থাকে; তাহাদের জ্বালায় আর্মেডিলো বড় ব্যতিব্যস্ত হয়। বাঁদরগুলি তাহাদিগকে প্রথমে খোঁচায়। যদি তাহারা গর্ত্তে প্রবেশ করে তবে লেজ ধরিয়া টানিয়া বাহির করিয়া যারপর নাই বিড়ম্বনা করে। যে আর্মেডিলোটীর ছবি দেওয়া হইল, কেবলমাত্র তাহারই নিকট বানরেরা কিঞ্চিৎ জব্দ থাকে। এই আর্মেডিলোর নাম বল্ আর্মেডিলো (Ball Armadillo)। বল আর্মেডিলো উপায়ান্তর না দেখিলে হাত পা গুটাইয়া লেজ মাথা গুঁজিয়া পাছা সামনে টানিয়া লইয়া বেশ একটী নীরেট গোলাকার জিনিস হইয়া থাকে। অপর পৃষ্ঠার (ছবি দেখ।)

বাঁদরেরা আর তখন ধরিয়া টানিবার মত কোন জিনিস পান না ; সুতরাং অপ্রতিভ হইয়া ঘরে ফিরিয়া যাইতে হয়।

ফুলের সাজি।

পঞ্চম অধ্যায়।

মনোরমার বিচার।

মনোরমা জাগিয়া দেখিল নিকটে দুই জন রাজপুরুষ দণ্ডায়মান। তাহারা মনোরমাকে তাহাদের সঙ্গে যাইবার জন্য সঙ্কেত করিল, সেও কিছু না বলিয়া তাহাদের সঙ্গে চলিল। সে সময়ে তাহার প্রাণের ভিতর যে কি হইতেছিল তাহা কে বলিতে পারে ? যদি কেহ কখন এমন অবস্থায় পড়িয়া থাকেন তিনিই বুঝিতে পারিবেন, বলিতে পারিবেন না। তাহার কণ্ঠ তালু শুকাইয়া গেল, চরণ যেন চলে না, বুক ধড় ধড় করিতে লাগিল। রাজকর্ম্মচারীরা তাহাকে বিচার-মন্দিরে লইয়া গেল। হায়! মনোরমার কপালে এত দুঃখও ছিল।

বিচারপতি তাহাকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, সে প্রশ্নগুলির যথার্থ উত্তর প্রদান করিল। মনোরমা কাঁদিয়া ফেলিল ; তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় আর কত সহ্য করিবে ?

বিচারক বলিলেন "বাছা, কাঁদ আর যাহা কর, আমার বেশ বোধ হইতেছে, একাজ তুমি ভিন্ন আর কেহ করে নাই, আমাকে তুমি প্রতারণা করিতে পারিবে না, বরং নিজ দোষ সহজে স্বীকার কর।"

মনোরমা, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "না ধর্ম্ম অবতার! আমি ইহার কিছুই জানি না। আমি যাহা করি নাই কিরূপে তাহা করিয়াছি বলিয়া স্বীকার করিব!" বিচারপতি বলিলেন, "রাজ কুমারীর একটী দাসী তোমার হাতে সেই আংটী দেখিয়াছে, আর মিথ্যা কথা বলিও না।" তখন তাঁহার আজ্ঞায় নিকটস্থ ভৃত্যেরা মায়াকে তথায় উপস্থিত করিল।

আমরা বিচারের কথা পরিত্যাগ করিয়া রাজবাটীতে মায়া কি অবস্থায় ছিল তাহা পাঠক পাঠিকাকে জ্ঞাপন করিব।

রাজকুমারী হেমলতা মনোরমাকে মহামূল্য বস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহাকে দেন নাই এই

হিংসায় ও রাগে মায়া জ্বলিয়া উঠিল এবং যাহাতে মনোরমা কুমারীর চক্ষুঃশূল হয় তাহা করিবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইল। সে রাজ বাটীর চারি দিকে সকলের কাছে বলিয়া বেড়াইল—"আংটী আর কে নেবে, সেই হতভাগা চাষার মেয়েটারই এই কাজ, যখন সে রাজ কন্যার গৃহ হইতে নামিয়া আসিতেছিল আমি তার হাতে সেই হীরার আংটী দেখিয়াছি, সে যেই আমায় দেখিল অমনি চম্‌কিয়া উঠিল, এবং তাড়াতাড়ি আংটী-টাকে কাপড়ের ভিতর লুকাইয়া ফেলিল। আমি তখন জোর করিয়া তাহার কাপড় দেখিলাম না, ভাবিলাম রাণীমা আংটীটা উহাকে দিয়া থাকিবেন; তিনি তাহাকে বড় ভাল বাসেন এবং ইহার আগেও অনেক জিনিস দিয়াছেন। আরও ভাবিলাম যদি সে ঐ আংটী চুরী করিয়া থাকে তাহা হইলে এখনি আংটীর খোঁজ পড়িবে, তখন আমি যাহা দেখিয়াছি বলিয়া দিব। ভাগ্যবলে আমি সে সময়ে ঘরে ছিলাম না, তাহা হইলে মেয়েটা হয়ত আমাকেই চোর বলিয়া ধরাইয়া দিত।" রাজপরিবারগণ মনে করিল মায়া যাহা বলিতেছে ইহাই ঠিক।

মায়া বিচারপতির পার্শ্বে সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মান হইল, বিচারক বলিলেন,—"মায়া! ঈশ্বর সকল স্থানে আছেন তাঁহার সমক্ষে সত্য করিয়া বল তুমি আংটীর বিষয় কি জান?"

মায়ার বুক কাঁপিয়া উঠিল এবং তাহার গা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল কিন্তু রাক্ষসী বিচারপতির কথায় বা নিজের বিবেকের কথায় কর্ণপাত করিল না—ভাবিল "যদি আমি সত্য বলি তবে আমার কাজটিত যাবেই, লাভের মধ্যে আমাকে কারাগারে বন্দিনী হইতে হইবে, তাহা হইবে না।" সে বলিল, "মনোরমা তোর মনে এত ছিল, আংটী আমি যে তোর হাতে দেখিয়াছি এখন অস্বীকার কর্‌ছিস কি করে?"

মনোরমা তাহার মিথ্যা কথা শুনিয়া বিস্মিত হইল, সে মায়ার মত নহে যে তাহাকে ফিরাইয়া কটু বলিবে; অবিরল ধারে তাহার নয়ন হইতে অশ্রু পতিত হইতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"তুমি মিথ্যা বলিতেছ, তুমি কখন আমার হাতে আংটী দেখ নাই, কেন তুমি অকারণে আমার সর্ব্বনাশ করিতেছ, আমি ত তোমার কোন অনিষ্ট করি নাই।"

কিন্তু মায়ার মন কিছুতেই বিচলিত হইবার নয়, সে নিজের ইষ্ট অনিষ্ট খুব বুঝে। মায়া ক্রমাগত এক কথাই বলিল। বিচারপতি নানারূপে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না—মায়া বড় চতুর।

তখন বিচারপতি বলিলেন "মনোরমা তুমি নিশ্চয়ই দোষী, মায়া তোমার হাতে আংটী দেখিয়াছে, এবং এই সমস্ত ঘটনাগুলি দেখিলে বোধ হয় তুমি ভিন্ন আর কেহ একাজ করে নাই, আংটী কোথায় রাখিয়াছ বল।"

মনোরমা তখনও সেই এক কথা বলিল,—বিচারক আজ্ঞা দিলেন, "যতক্ষণ না দোষ স্বীকার করিবে ততক্ষণ ইহাকে বেত্র প্রহার কর" কিন্তু কিছুতেই সত্য মিথ্যা হয় না। প্রহার খাইয়াও মনোরমা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল, বলিল, "আমি কিছু জানি না, কিছু জানি না" হায়! কেহই তাহার কথা শুনিল না।

অবশেষে তাহাকে আবার কারাগারে পাঠান হইল। মনোরমার দশা দেখিলে আজ পাষাণও গলিয়া যায়, তাহার মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে, পূর্ব্বের শ্রী কিছুই নাই, শরীর ক্ষত বিক্ষত

হইয়াছে এবং ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে। প্রহারের বেদনায় সে অস্থির হইল, সেদিন অনাহারেই কাটিয়া গেল এবং রাত্রে অনেকক্ষণ চক্ষু বুজিল না, কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষে হরিকে প্রাণের সকল জ্বালা নিবেদন করিল। পরে সে কতক শান্তি বোধ করিয়া নিদ্রাভিভূত হইল।

পরদিন আবার তাহাকে বিচার গৃহে লইয়া যাওয়া হইল। বিচারপতি দেখিলেন বল প্রয়োগে কোন ফল হইল না, তিনি এখন মিষ্ট কথায় ও প্রতারণা বাক্যে মনোরমার মনের কথা জানিতে চেষ্টা করিলেন, বলিলেন, "তুমি জান চুরি করার শাস্তি প্রাণ দণ্ড, তোমায় এই দণ্ড পাইতে হইবে। কিন্তু এখনও যদি বল কোথায় আংটী রাখিয়াছ তাহা হইলে আমি তোমায় ছাড়িয়া দিব। কাল তোমায় যে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট হইবে, আর কিছুই দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে না, তোমার পিতাকেও ছাড়িয়া দিব, আবার সুখে বাড়ী ফিরিয়া যাইবে এখনও বল আংটী লইয়া কি করিয়াছ? মৃত্যু ও জীবন তোমার কথার উপর নির্ভর করিতেছে, দেখ আমি তোমার মঙ্গলের জন্যই বলিতেছি।"

মনোরমা একই কথা বলিল। বিচারপতি তাহার আশ্চর্য্য পিতৃভক্তি বুঝিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "দেখ মনোরমা তুমি যদি তোমার আপনার প্রাণের উপর যত্ন না কর, বৃদ্ধ পিতার কথা যেন তোমার মনে থাকে। তোমার পিতার শুভ্র-কেশযুক্ত মস্তক জল্লাদের অস্ত্রের দ্বারা দুই খণ্ড হইবে, তাহা কি দেখিতে ইচ্ছা কর? তোমার পিতার পরামর্শে তুমি তোমার দোষ স্বীকার করিতেছ না, তাহা কি আমি বুঝি নাই?"

মনোরমা এই কথা শুনিয়া ভয়ে মৃতপ্রায় হইল, সে জড়ের ন্যায় বিহ্বলের ন্যায় তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার মুখে কথা সরিল না।

কঠিন হৃদয় বিচারপতি তবুও বলিলেন, "স্বীকার কর, "হাঁ" এই সামান্য কথায় তোমার পিতার জীবন রক্ষা হইবে।"

তখন সে একবার ভাবিল "যদি একটা মিথ্যা কথা বলিলে পিতার প্রাণ রক্ষা হয় ক্ষতি কি, বলি, আমি আংটী লইয়াছিলাম বটে কিন্তু পথে আসিবার সময় হারাইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার মনের ভিতর হইতে তখনি কে বলিল 'না মনোরমা মিথ্যা বলিও না সত্য বল যাহা হয় হউক মিথ্যার সমান পাপ নাই'; মনোরমা অন্তরে ঈশ্বরকে ডাকিয়া বলিল, দয়াময় হরি তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর আমাদিগকে হয় রাখ, নয় মার।"

মনোরমা কাতরস্বরে তখন বলিল "যদি আমি বলি আমি আংটী লইয়াছি তাহা হইলে আমার মিথ্যা বলা হইবে আমি আপনার প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য মিথ্যা বলিব না, কিন্তু যদি প্রাণ দণ্ড গ্রহণ করা হয় তবে যেন শুধু আমারই প্রাণ দণ্ড হয়, আমার বৃদ্ধ পিতাকে যেন কোন শাস্তি না দেওয়া হয়! বৃদ্ধ বলিয়া তাঁহার প্রতি দয়া করুন। আমি তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছি।"

উপস্থিত ব্যক্তিগণ বালিকার কথা শুনিয়া গলিয়া গেল, কঠিন প্রাণ বিচারকেরও হৃদয় গলিল, তিনি আর কোন কথা কহিলেন না। ধন্য মনোরমা তোমার ঈশ্বর বিশ্বাস! ধন্য তোমার সত্যবাদিত্ব! ধন্য তোমার পিতৃভক্তি!

জানোয়ারের বুদ্ধি।

অনেক বার পাঠক পাঠিকা! তোমাদিগকে গুটিকত জানোয়ারের বুদ্ধির গল্প শুনাইব। তোমরা জান হাতি বড় বুদ্ধিমান জন্তু। হাতির বুদ্ধির অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্প শুনিতে পাওয়া যায়, তোমরাও অনেক গল্প শুনিয়া থাকিবে। আজ আর একটা শুন। দুই জন ইংরাজ একদেশে বাস করিতেন। তাহারা পরস্পরের বন্ধু। এই দুই জন ইংরাজের মধ্যে একজনের একটী হাতি ছিল। তিনি হাতিটীকে বড় ভাল বাসিতেন। একবার কোন কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে স্থানান্তরে যাইতে হয়। তখন তিনি তাঁহার বন্ধুর বাড়ীতে হাতিটীকে রাখিয়া যান। তাঁহার বন্ধুর স্ত্রীর হাতিটীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল, পাছে তত্ত্বাবধানের ত্রুটিতে হাতিটী রোগা হইয়া যায়, মনে এই ভয় ছিল, এই জন্য তিনি সর্ব্বদা হাতিটী তদারক করিতেন। কিন্তু কিছুদিন বাদে দেখা গেল যে, হাতিটী রোগা হইয়া যাইতেছে। দেখিয়া বিবি বড় ভাবিত হইতে লাগিলেন। ভিতরের কথা এই, যে ঐ হাতির মাহুত বড় দুষ্ট লোক। সে প্রত্যহ হাতির খোরাকের দানা হইতে এক এক পুটুলি দানা লুকাইয়া রাখিত, এবং তাহা চুরি করিয়া বিক্রয় করিত। বিবি তাহা ধরিতে পারিতেন না বলিয়া কিছু বলিতে পারিতেন না, কিন্তু তাঁহার মনে মনে সন্দেহ থাকিয়া যাইত। একদিন হাতির আহারের সময় তিনি স্বয়ং আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু ঐ দুষ্ট মাহুত বিবি আসিবার পূর্ব্বেই এক পুটুলি দানা চুরি করিয়া নিজের বগলে রাখিয়াছিল; এবং একখানি কম্বলে আপনার সমুদায় শরীর ঢাকিয়া, সাধু সাজিয়া অনেক মিষ্ট কথা বলিতেছিল। মেম যখন তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন "তুই নিশ্চয় হাতির দানা চুরি করিস্ নতুবা হাতি রোগা হইতেছে কেন? সে ভদ্রলোক বিশ্বাস করিয়া আমার নিকটে হাতিটী রাখিয়া গিয়াছে, আমি হাতিটী রোগা করিয়া ফিরাইয়া দিব কি?" সেই দুষ্ট মাহুত মিষ্ট বচনে বলিল "মেম! আমি কি উহার আহারের দানা চুরি করিতে পারি; ও আমার বেটা, আমার মানিক।" এই বলিয়া হাতিকে অনেক আদর করিতে লাগিল। দানার পুটুলিটী তখনও তাহার বগলে আছে। সে যখন দানা চুরি করে হাতি তখন দেখিয়াছিল, এবং সে যে পুটুলিটী বগলে লুকাইয়া রাখিয়াছে তাহাও হাতি জানিত। সুতরাং যখন সে কপট ভালবাসা দেখাইয়া অনেক আদরের কথা বলিতেছে, তখন হাতি খস্ করিয়া তাহার গলার কম্বলখানি কাড়িয়া লইল এবং বগল হইতে পুটুলিটী টানিয়া বিবির সমক্ষে ফেলিয়া দিল। কি বুদ্ধি!

ক্রমশঃ

ধাঁধা।

গত সেপ্টেম্বর মাসের ধাঁধার উত্তর।

১। ৩৬ পয়সা লোকসান হইয়াছিল।

করিতে লাগিলেন। অন্য লোকে তাঁহার দোষ দেখিয়া যত না তিরস্কার করেন, তিনি নিজে তাঁহার দোষগুলি পরিষ্কার বুঝিয়া নিজকে তার চেয়ে অধিক তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তাঁহার দোষ দূর করিবার জন্য এতদিন লোকেরা তাঁহাকে কত উপদেশ দিয়াছে, পিতা মাতা কত তিরস্কার করিয়াছেন, অধিক কি প্রহার করিতে পর্য্যন্ত ছাড়েন নাই, কিন্তু তাহাতে তাঁহার বিশেষ কোন উপকার হইল না। যখন তিনি নিজের দোষের বিষয়ে নিজে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ভাল হইবার ইচ্ছা আগুনের ন্যায় যখন তাঁহার প্রাণকে পোড়াইতে লাগিল, তখন একে একে এই কয়েকটী সত্য তিনি নিজের জীবনে লাভ করিলেন।

(১) নিতান্ত দরকার না হইলে বৃথা কথা কহিব না, এবং খুব ভাল করিয়া না বুঝিয়া কাহারও কোন কথার উত্তর দিব না।

(২) উপযুক্ত না হইয়া কখনও কিছু পাইবার আশা করিব না এবং কেহ দিলেও গ্রহণ করিব না।

(৩) লোকে নিন্দা করিলে রাগ না করিয়া এই বুঝিব যে, আমার ভিতরে এমন কোন দোষ আছে, যাহা দূর করা উচিত।

এই তিনটী চিন্তা সর্ব্বদাই প্রকাশের মনে থাকিত এবং সকল সময়েই তিনি এই অমূল্য সত্যগুলি জীবনে পালন করিতে চেষ্টা করিতেন।

একদিন প্রকাশ পিতার সহিত রেলের গাড়ীতে যাইতেছিলেন, গাড়ীর ভিতরে তাঁহার পিতার সহিত আর কয়েকটী ভদ্রলোকের নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা, তর্ক বিতর্ক হইতেছিল, প্রকাশ কোন কথা না বলিয়া তাঁহাদের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহাদের কথা শেষ হইলে তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রকাশকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ওহে বাবু তুমি যে কিছু বল না!" প্রকাশ একটু হাসিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। প্রকাশের বাবা প্রকাশের এই নূতন ভাব দেখিয়া অবাক হইলেন। সেই ভদ্রলোকটী কিন্তু প্রকাশকে একটী নিরেট বোকা ঠাওরাইলেন।

আগুন যেমন কাপড়ে বাঁধিয়া রাখা যায় না, মানুষের সৎগুণগুলিও তেমনি প্রাণের মধ্যে ঢাকা থাকে না; উপযুক্ত সময়ে বাহির হইয়া পড়ে। প্রকাশের হঠাৎ পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাঁহার মা একদিন বলিলেন, "এতদিন পরে কার কথায় তোর এমন হইল?" প্রকাশ বিনীতভাবে বলিলেন, "মা, এখনও আমার কিছু হয় নাই, আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার সকল দোষ দূর করিয়া আপনাদিগকে সুখী করিতে পারি। আর আমার মনে বিশ্বাস হইতেছে, মা! পরমেশ্বর আমার প্রাণের ভিতরে আছেন, তিনি যদি আমার প্রাণের ভিতরে না থাকিতেন তবে আমার প্রাণে ভাল হইবার জন্য এইরূপ ইচ্ছা কে জন্মাইয়া দিল?"

উভয় সঙ্কট।

ঘোষেদের কুলের বাগানে
কুলগুলি পেকে যে রয়েছে!
কি মধুর নারিকেলি কুল!
মনে হলে মুখে জল আসে

"চারি দিকে রয়েছে প্রাচীর
কেমনেতে ঢুকিব সেখানে।
দুরন্ত কুকুর নাকি আছে,
তাই বড় ভয় হয় মনে।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে
বিপিন যেতেছে গৃহপানে।
পাঠশালে যাহা শিখিয়াছে
কিছু কিন্তু নাই তার মনে।

অবশেষে বাগানের কাছে
এসে দেখে, কেহ নাই সেথা।
পড়েছিল "চুরি করা পাপ,"
লোভে আজ ভুলিল সে কথা।

তাড়াতাড়ি ঘরে ছুটে গিয়ে
বইগুলি কোথা ফেলে দিল;
আনন্দেতে হইয়া অধীর
থ'লে নিয়ে বাহিরে চলিল।

পিছু পিছু ডাকিছেন মাতা;
সে ডাক কি যায় তার কাণে?
কুলের কি সুমিষ্ট আস্বাদ
তাই সুধু জাগিতেছে মনে।

এসে দেখে পূর্ব্বের মতন
গাছতলা, কেহ কোথা নাই।
মনে মনে ভাবিল বিপিন,
"এবে আমি কাহারে ডরাই।"

আস্তে আস্তে উঠিল প্রাচীরে,
নিঃশব্দেতে নাবিল বাগানে;
দুর্ দুর বুক কাঁপে তার,
চারিদিকে চাহিছে সঘনে।

ধীরে ধীরে গাছেতে উঠিল;
ডালে বসি চারিদিকে চায়;
মুখে কুল; কিন্তু মনে ভাবে
"কেহ যেন দেখিতে না পায়?"

এইরূপে ভয়ে ভয়ে তার
শান্ত যবে হইল উদর।
থ'লে পূরে নাবে গাছ হ'তে
আনন্দেতে প্রফুল্ল অন্তর।

মনে ভাবে "দেখিল না কেহ,
আজি মোর 'সৌভাগ্যের দিন';
(হায় মূর্খ! জান না কি আছে
একজন জেগে নিশিদিন।)

এত ভাবি অবোধ বালক
গাছ হ'তে নাবিতে নাবিতে—
সর্ব্বনাশ!—বাগানের পাশে
কুকুর যে পাইল দেখিতে।

কুকুর দেখিয়ে তারে গাছে,
প্রাণপণে ডাকিতে লাগিল।
আস্তে আস্তে কোনরূপ করি
গাছ হতে বিপিন নাবিল।

প্রাচীরেতে উঠিয়া সত্বর
পিছুদিকে নাবিতে সে যায়;—
কুকুরের ডাক শুনি মালি
হেন কালে আইল তথায়।

পাছে তার ডাকিছে কুকুর,
থ'লে হতে কুল পরে যায়,
মালি এসে হাত ধরে তার;
বিপিন ঠেকিল মহাদায়।

জিহ্বার শুনিয়ে কুমন্ত্রণা,
পরদ্রব্য লইতে এমন,
তোমরা কি চাওগো পড়িতে
এইরূপ বিপদে কখন?

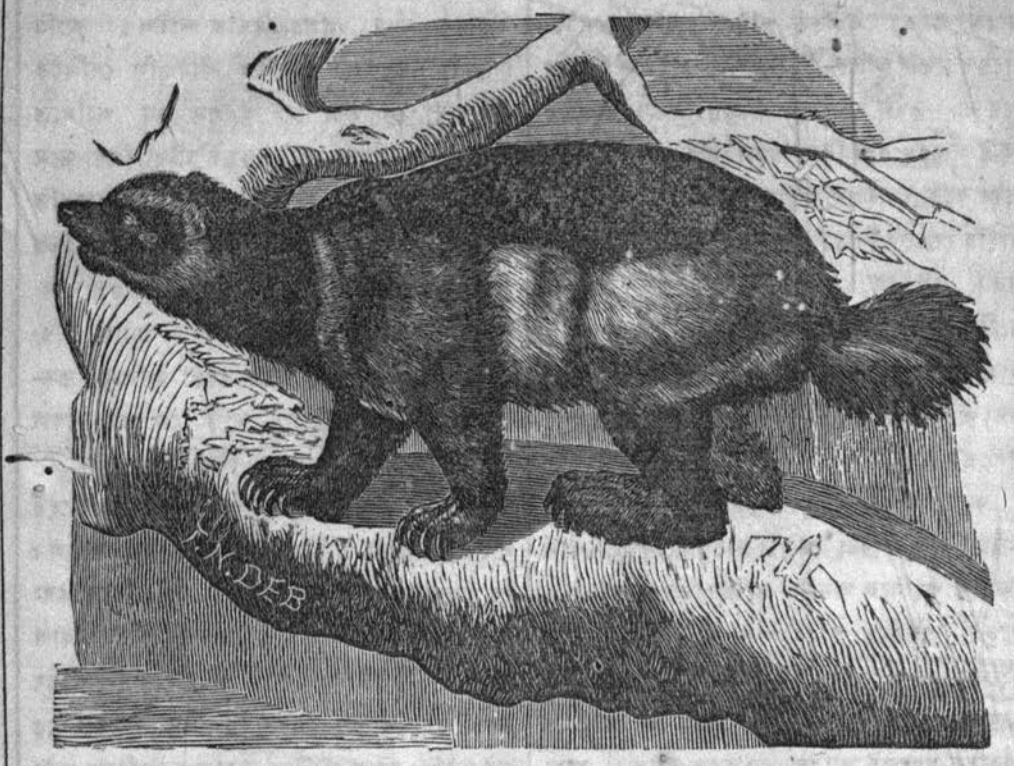

গ্লটন্।

উপরে যে জানোয়ারের ছবি দেখিতেছ তাহার বাড়ী আমাদের দেশে নয়। উত্তরের শীত-প্রধান দেশ সকলে ইহারা বাস করে; কাম্‌স্কট্‌কা উপদ্বীপে ইহারা খুব বেশী পরিমাণে থাকে। ঐ সকল শীতপ্রধান দেশে ভোদড় জাতীয় অনেক প্রকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু বাস করে; তাহারা নিশাচর বৃত্তি করিয়া জীবন ধারণ করে। তাহাদের জ্বালায় সেখানকার লোকেরা সর্ব্বদা বতিব্যস্ত থাকে। গৃহপালিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আহারীয় পশু-পক্ষীর প্রতি ইহাদের বড়ই অনুরাগ। এই কারণে ঐ সকল দেশের অধিবাসীদিগের সহিত ইহাদের শত্রুতা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। এর উপর আবার এই সকল পশুর চর্ম্ম অতিশয় মূল্যবান্। সুতরাং ইহাদিগকে বধ করিবার জন্য নানা প্রকার উপায় অবলম্বিত হয়। এরূপ অনেক লোক আছে যে, নানা প্রকার কৌশল করিয়া ঐ সকল জন্তু ধরাই তাহাদের ব্যবসায়। আমরা যে জন্তুর কথা কহিতেছি, সেও এই জাতীয়; কিন্তু তাহার স্বাভাবিক ধূর্ত্ততা এত বেশী যে, তাহাকে কেহই ধরিতে পারে না।

গ্লটনের সম্বন্ধে পূর্ব্বকালে লোকের অনেক আশ্চর্য্য সংস্কার ছিল। তখনকার একটা পুস্তকে লেখা আছে যে, ঐ গ্লটন যদি কোন বড় জন্তুর মৃত শরীর দেখিতে পায় তবে অমনি উহাকে খাইতে

আরম্ভ করে। খাইতে খাইতে যখন পেটটা ঢাকের মতন ফুলিয়া উঠে—আর তাহাতে জিনিস ধরে না—তখন গ্লটন খুব নিকট নিকট অবস্থিত দুইটী গাছের মধ্য দিয়া শরীরটাকে নিয়া যাইতে চেষ্টা করে। এইরূপ করাতে ভয়ানক চাপ পড়িয়া তাহার পেটের ভিতরের সব জিনিস বাহির হইয়া যায়। এইরূপে পেট খালি হইলে গ্লটন্ আবার আসিয়া খাইতে আরম্ভ করে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আহার্য্য পদার্থ একেবারে ফুরাইয়া না যায়, ততক্ষণ এই উপায়ে ক্রমাগত ভক্ষণ এবং উদ্গীরণ চলিতে থাকে।

অনেকে বলিয়াছেন যে, গ্লটন্ কোন গাছে উঠিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে; নীচে কোন বড় জন্তু আসিলে অমনি তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়ে। এইরূপে হঠাৎ পড়াতে তেমন প্রকাণ্ড জানোয়ারটাও ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া যায় আর আত্মরক্ষা করিতে পারে না। গ্লটন্ এই অবস্থায় তাহাকে সহজেই মারিয়া ফেলিতে পারে। যাহা হউক আধুনিক অনেক পণ্ডিতের এই মত যে, গ্লটন্ গাছে উঠিতে তত পটু নহে; সুতরাং এই সকল গল্পকে গল্পের ভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে।

গ্লটন্ জানোয়ারটী আড়াই ফুটও লম্বা হইবে না, কিন্তু তাহার বুদ্ধি বড় বেশী। শিকারিরা অন্যান্য জন্তু ধরিবার জন্য যে ফাঁদ পাতে, গ্লটন্ অনায়াসে তাহার ভিতরের আধারটুকু খাইয়া যায়। ফাঁদে কোন ছোট জানোয়ার পড়িলে তাহাও উদরস্থ করে। গ্লটন্‌কে এপর্য্যন্ত খুব কম লোকেই ফাঁদ পাতিয়া ধরিতে পারিয়াছে। নিম্নে একজন শিকারীর লিখিত একটী গল্প অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল।

"একবার একটা বৃদ্ধ গ্লটন্ আমার মার্টেন্ (ভোদড় জাতীয় আর এক প্রকার ক্ষুদ্র জন্তু) ধরিবার ফাঁদ গুলির খোঁজ পাইল। আমি পোনের দিন পর একদিন ফাঁদগুলি দেখিতে যাইতাম, সে তার চাইতে ঘন ঘন আসিতে লাগিল। ইহাতে আমি বড়ই চটিয়া গিয়া মনে করিলাম যে, যেরূপেই হউক ইঁহার চৌর্য্যবৃত্তি বন্ধ করিতেই হইবে। এই ভাবিয়া আমি ভিন্ন ভিন্ন ছয় স্থানে ছয়টা মজবুত ফাঁদ প্রস্তুত করিলাম এবং তিনটা লোহার ফাঁদও সংগ্রহ করিলাম। তিন সপ্তাহ কাল চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। সে এই সকল ফাঁদের কাছেও গেল না, কিন্তু আমার মার্টেন্ ধরিবার ফাঁদগুলিকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহের সহিত ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া ফেলিতে আরম্ভ করিল। যে সকল মার্টেন ফাঁদে পড়িত; সে গুলিকে এবং ফাঁদে যে সকল আধার দেওয়া হইত তাহাও খাইয়া ফেলিতে লাগিল। তখনকার দিনে বিষ খাওয়াইয়া মারার নিয়ম ছিল না, সুতরাং এর পর আমি বন্দুক পাতিয়া তাহাকে মারিতে চেষ্টা করিলাম। বন্দুকটীকে একটা ছোট পুকুরের ধারে একটা ঝোপের ভিতর রাখিয়া দিলাম, আধারটা এরূপভাবে রাখা হইল যে গ্লটন সেই পথে যাইবার সময় তাহা দেখিবেই। এর পর প্রথম যে দিন সেই স্থান দেখিতে গেলাম সে দিন দেখিলাম যে গ্লটন সেখানে আসিয়াছিল; কিন্তু আধারটাকে ছোঁয় নাই, কেবল শুঁকিয়াই চলিয়া গিয়াছে। ইহার পরের বারে আসিয়া প্রথমেই যে দড়ি দ্বারা বন্দুকের কলের সহিত আধারের সংযোগ ছিল সেই দড়িটীকে কাটিয়াছে, (কাটিয়াছে আবার বন্দুকের মুখের একটু পেছনে, যেন কাটিবার সময়ে হঠাৎ বন্দুক ছুটিয়া গেলেও গুলি গায় না লাগে) তার পর নিশ্চিন্ত মনে আধারটী লইয়া গিয়া পুকুরের ধারে বসিয়া খাইয়াছে। সেই

খানে গিয়া আমি দড়িগাছ পাইলাম। ইচ্ছাপূর্ব্বক এত বুদ্ধি খরচ করিয়াছে ইহা আমি কোন মতেই বিশ্বাস করিতে পারিলাম না; কারণ ঐরূপ করিতে হইলে ঠিক মানুষের বুদ্ধির সমান বুদ্ধির আবশ্যক করে। সুতরাং আমি আবার কল পাতিয়া রাখিলাম। দড়িটী যেখানে ছিঁড়িয়াছিল সেইখানে বাঁধিয়া দিলাম। কিন্তু ক্রমাগত তিনবার অবিকল একই রকম ফল পাইলাম। আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে দড়িটী যে জায়গায় বাঁধিয়া দেওয়া গিয়াছে প্রত্যেকবার তাহার একটু পেছনে কাটিয়াছে,—কিজানি যদি ইহাঁর মধ্যেও আমি তাহার বিনাশের জন্য কোনরূপ ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া থাকি। এই সকল দেখিয়া আমি এই সিদ্ধান্ত করিলাম যে, এইরূপ বুদ্ধিমান্ জন্তুর বাঁচিয়া থাকাই উচিত।"

হঠাৎ মানুষের সহিত দেখা হইলে প্লটন্ দুই পায়ের উপর বসিয়া এক হাতে চক্ষের উপর ছায়া দিয়া (আমরা অনেক দূরের জিনিস রৌদ্রের সময় দেখিতে হইলে যেমন করি) তাহাকে দেখে। এইরূপ করিয়া দুই তিন বার চাহিয়া দেখিয়া তার পর পলাইতে চেষ্টা করে।

বনলতা।

কালীকান্ত বাবুর পরিবারে সুখ নাই। প্রায় সাত আট বৎসর হইল তাঁহার একটী মাত্র ছেলে বিনয় কোথায় যে গিয়াছে কেহ জানে না; সেই অবধি কালীকান্ত বাবু এবং তাঁহার স্ত্রী নিতান্ত মনোদুঃখে দিনপাত করিতেছেন। পরিবারের মধ্যে কালীকান্ত বাবু, তাঁহার স্ত্রী এবং একটি বার বৎসরের মেয়ে। বনলতা যখন ছোট ছিল তখন প্রায়ই মামার বাড়ীতে থাকিত, কারণ মার চেয়ে সে দিদিমাকে অধিক ভাল বাসিত। বনলতার যখন দুই বৎসর বয়স তখন সে একবার মামার বাড়ী যায়, এবং ক্রমাগত ৩।৪ বৎসর সেখানেই থাকে; এই ৩।৪ বৎসরের মধ্যে সে বিনয়কে একবারও দেখে নাই। তারপর যখন বাড়ী আসিল তখন বনলতা ৫।৬ বৎসরের হইয়াছে, বাড়ী আসিয়া আর সে বিনয়কে দেখিতে পায় নাই। বনলতা বাড়ী আসিলে কালীকান্ত বাবু ও তাঁহার স্ত্রী বনলতাকে কিছুই জানিতে দেন নাই। পাছে তাহার জীবন দুঃখময় হইয়া যায় এই আশঙ্কায় তাঁহারা আপনাদিগের মনোকষ্ট গোপন করিয়া রাখিতেন। তাহাকে কিছুই বুঝিতে দিতেন না।

পশ্চিমাঞ্চলে কোন স্থানে কালীকান্ত বাবু থাকিতেন। একটি ছোট পাহাড়ের উপর বাড়ীটী স্থাপিত, চারিদিকে সুন্দর বাগান, স্থানটি বড়ই সুন্দর। বনলতা বনে বনে বেড়াইতে বড়ই ভালবাসিত; কখনও ঝরণার কাছে, কখনও গাছের তলায়, কখনও লতাকুঞ্জে বসিয়া থাকিত। একদিন সকাল সকাল বনলতা বেড়াইতে বাহির হইল। অন্য অন্য দিন কেহ তাহার সঙ্গে যাইত, কিন্তু আজ সে একাকীই বাহির হইল। পাহাড়ের উপর একটি পথ অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে, বনলতা মনের আনন্দে ও উৎসাহে সেই পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। ক্রমে বেলা অধিক হইল, সূর্য্যের প্রখর তাপে বনলতা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু তখনও তাহার বেড়াইবার সাধ কমে নাই; পথের ধারে একটি সুন্দর ঝোপের কাছে বসিয়া খানিক বিশ্রাম করিয়া আবার চলিতে লাগিল। কতদূর গিয়া একটি ছোট পথ দেখিতে পাইল, পথের দুপাশে বড় বড় গাছ রহিয়াছে, গাছে ফুল ফুটিয়াছে, ফল ধরিয়াছে, পাখী ডাকিতেছে; সেখানে কিছুমাত্র রৌদ্রের তেজ নাই। বনলতা তখন ভাবিল এই পথে যাই,—এ পথে রৌদ্রের তেজ নাই, চলিতেও বেশ সুবিধা হইবে, অধিক ক্লান্ত হইব না। এই ভাবিয়া সেই পথে চলিতে লাগিল। কতক দূর যাইয়া দেখিল পথটি ক্রমে ছোট হইতেছে এবং ক্রমে নিবীড় বনের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে; তখন তাহার মনে একটু ভয় হইল, ভাবিল "এ পথ জানি না, ক্রমে গভীর বনের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম, যদি পথ হারাইয়া যাই, যদি আর ফিরিয়া যাইতে না পারি' তাহা হইলে

কি দশা হইবে?—যে পথে যাইতেছিলাম সেই পথে যাওয়াই ভাল ছিল। কিন্তু আবার ভাবিল যে এখন রৌদ্রের উত্তাপ অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, সে পথটি সহজ হইলেও সে পথে চলা বড় কষ্টকর, সে পথ অপেক্ষা এ পথ শতগুণে ভাল। কোথাও সুন্দর ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, কোথাও পাখী গান করিতেছে, কোথাও ঝরণার ঝর ঝর শব্দ হইতেছে, শীতল বাতাসে শরীর জুড়াইতেছে,—এই পথে যাই, না হয় আর খানিক যাইয়া ফিরিয়া আসিব।" বনলতা কখনও দাঁড়াইয়া পাখীর গান শোনে, কখনও অন্যমনস্ক হইয়া ঝরণার কাছে দাঁড়াইয়া থাকে, কোথাও পাহাড়ের উপরে একটি সুন্দর ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে,—তাহাই আনিতে পাহাড়ের উপর উঠে, কখনও নদীর স্রোতে কোথা হইতে ফুল ভাসিয়া আসিতেছে তাহাই দেখিবার জন্য নদীর তীর ধরিয়া চলিতে থাকে;—এইরূপে ক্রমে সে গভীর হইতে গভীরতর বনের মধ্যে আসিয়া পড়িল।

ক্রমে বেলা অবসান হইল, ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল দেখিয়া সে একটু চিন্তিত হইল। তখন বাটী ফিরিবার জন্য বড় ব্যগ্র হইল, কিন্তু গভীর বনের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, ক্রমে অন্ধকার হইতেছে, এখন কোন পথে বাহির হইবে আর তাহা স্থির করিতে পারিল না, তখন সে অত্যন্ত ভীত হইল। ক্রমে অন্ধকার গাঢ় হইতে লাগিল, আকাশ মেঘে ছাইয়া ফেলিল, ক্রমে ভয়ঙ্কর ঝড় উঠিল। অন্ধকারে বনের সিংহ্র জন্তুগুলি বাহির হইল, তাহাদের গর্জ্জনে বনলতার প্রাণ কাঁপিতে লাগিল। তখন বিপদ বুঝিল; আগে না বুঝিয়া নির্ব্বোধের মত যে কাজ করিয়াছে তার জন্য আপনাকে কতই তিরস্কার করিল। বুঝিল নির্ব্বোধের মত কেবল সুখ সচ্ছন্দতা অন্বেষণ করিলে কেমন বিপদে পড়িতে হয়। তখন সেই অসহায়া বালিকা ব্যাকুল হইয়া জোড় হস্তে ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে লাগিল; ক্রমে যেন মনে একটু বল পাইল, যেন একটু সাহস হইল। তখন অতি কষ্টে একটু একটু চলিতে লাগিল। কতক দূর যাইয়া দূরে একটি আলো দেখিতে পাইল। তখন তাহার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইল, আশা ও আনন্দের উদয় হইল। আলোক লক্ষ্য করিয়া ক্রমাগত সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। এবং দেখিল এক ক্ষুদ্র কুটীরের মধ্যে আলো জ্বলিতেছে। বনলতা কুটীরের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল, ভয়ে ভয়ে দ্বারে আঘাৎ করিতে লাগিল। তখন দ্বার খুলিয়া এক সন্ন্যাসী বাহির হইলেন। বাহিরে একাকী অসহায়া বালিকাকে দেখিয়া, তাহাকে কুটীর মধ্যে লইয়া গেলেন। সন্ন্যাসী বালিকাকে দেখিয়া যেন একটু চমকিত হইলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, এমন সময়ে এই হিংস্র জন্তু পূর্ণ নিবিড় বনের মধ্যে তুমি কেন আসিয়াছ? বালিকা তখন সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে বলিল। সন্ন্যাসী ধীর ভাবে সমস্ত শুনিলেন, তারপর বলিতে লাগিলেন "আজিকার ঘটনা তুমি কখনও ভুলিও না, ইহা হইতে তুমি যথেষ্ট উপদেশ পাইবে। আজিকার ঘটনার সহিত মানুষের জীবনের সুন্দর তুলনা করা যাইতে পারে। দেখ মানুষ যখন প্রথম সংসারে প্রবেশ করে, তখন তাহার হৃদয় আশা ও উৎসাহে পূর্ণ থাকে। সেই আশা ও উৎসাহ লইয়া সে সৎপথে চলিতে থাকে, তখন সৎপথে থাকিয়া যে সুখ পায়, তাহাতেই সে তৃপ্ত হয়। কিন্তু যখন সে সুখ তাহার আর যথেষ্ট মনে হয় না, তখন আরও সুখ স্বচ্ছন্দতা চায়, তখন সৎপথে থাকা তাহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া দাঁড়ায়, সে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, সে আর চলিতে পারে না। সৎপথে চলিতে হইলে অনেক সময় সুখসচ্ছন্দতা ভোগের বাসনা পরিত্যাগ করিতে হয়;—কিন্তু তাহা সে পারে না; ক্রমে সৎপথ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। মানুষ যখন কেবলমাত্র সুখ স্বচ্ছন্দতা অন্বেষণ করে, এবং তাহাই পাইবার জন্য ব্যগ্র হয়, তখন হইতে তাহার সর্ব্বনাশ হইতে থাকে, ক্রমে সুখের আশায় সে নানাপ্রকার প্রলোভনে পড়িয়া অসৎপথ অবলম্বন করে। কিন্তু এপথে আপাততঃ সুখ থাকিলেও পরিণামে কেবল দুঃখ। সুতরাং অল্পদিন পরেই তাহার মন অসুখ ও অশান্তিতে পূর্ণ হইয়া যায়। তখন মানুষ বিপদ বুঝিতে পারে, সৎপথ পরিত্যাগ করিয়া অসৎপথে আসিয়া নিজের

যে সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহা তখন বুঝিতে পারে, তখন মনে চিন্তা উপস্থিত, তখন শত চেষ্টায়াও ফিরিবার পথ সহজ খুঁজিয়া পায় না। পথ হারাইয়া দিন দিন আরও কুকার্য্যে রত হয়, এবং তাহাদ্বারা আপনাকে ভুলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে। কিন্তু ক্রমে যখন জীবন ফুরাইয়া আসে,—যখন উৎসাহ উদ্যম আর থাকে না, যখন চক্ষু নিস্তেজ হইয়া যায়,—চারিদিক অন্ধকার বলিয়া বোধ হয়, যখন আর চলিবার শক্তি থাকে না,—তখন আর এ সামান্য সুখে মানুষকে ভুলাইয়া রাখিতে পারে না। কিন্তু যাহাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে তাহারা এরূপ বিপদে পতিত হইয়াও নিরাশ হয় না। লক্ষ লক্ষ বিপদের মধ্যেও যে পরমেশ্বরকে স্মরণ করে,—যে তাঁহার উপর নির্ভর করে—সে নিশ্চয়ই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হয়; বিপথ হইতে পুনরায় সৎপথে আসিতে পারে। একথা কখনও ভুলিও না।"বুদ্ধিমতী বালিকা একাগ্র হইয়া সমস্ত শুনিল, উপদেশ হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিল। তখন সন্ন্যাসী বলিলেন—"আজ এই খানেই থাক, কাল তোমাকে গৃহে রাখিয়া আসিব।"

পরদিন পাড়ার লোকে দেখিল কালীকান্ত বাবুর বাড়ী মহা উৎসব হইতেছে। তাঁহাদের মুখে দুঃখের কালিমা আর নাই, আজ তাঁহারা আনন্দে ভাসিতেছেন। পাঠক পাঠিকা এত আনন্দ উৎসব কেন?—আজ এতদিন পরে কালীকান্ত বাবু নিরুদ্দেশ পুত্রকে পাইয়াছেন; তাই এত উৎসব। সেই সন্ন্যাসীই বিনয়কান্ত।

প্রতিবেশীরা কালীকান্ত বাবুর সুখে সুখী হইল। পিতামাতা পুত্র কন্যা পাইয়া সুখী হইলেন। বনলতা বিনয়কে পাইয়া সুখী হইল। ভাই বোনে একত্র হইয়া নানা সৎকাজে জীবন উৎসর্গ করিল।

পাঠক পাঠিকা! তোমরাও কি বিনয় ও বনলতার ন্যায় ভাই বোনে মিলিয়া সৎকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবে?

বর্ষশেষ।

দিন আসে দিন চলে যায়,
বর্ষ পিছে বরষ মিলায়।

তিলে তিলে পলে পলে দণ্ড চলি গেল,
দণ্ডে দণ্ডে প্রহর চলে যায়,
প্রহরে প্রহরে ওই দিন চলে গেল,
দিনে দিনে মাস গেল হায়!
মাসে মাসে ওই কত বর্ষ চলে গেল,
বরষে বরষে যুগ যায়,
একে একে ধীরে ধীরে সকলই মিশাল,
কালের সে আঁধার বেলায়।
কত গ্রীষ্ম কত বর্ষা কত চলি গেল
এল শীত বসন্ত ধরায়,
কত রবি, কত শশী, আকাশে উদিল;
কত এল যে গেল কোথায়!
—একজনও ফিরিল না হায়!—
ফিরিয়া চাহিয়া দেখি অতীতের পানে,
পুনঃ এক বর্ষ চলে গেল,
আশায় চাহিয়া কত কিবা যে করি মনে,
কিছু হায় কিছুই না হল।
কত যে ফিরাব করি মনে,
কিছুইত ফিরিল না হায়,
গেল যাহা হেলায় খেলায়
আর নাহি এল পুনরায়!

দিন এল দিন চলে গেল
বর্ষপিছে বরষ মিশাল।

IMPERIAL LIBRARY.